ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু — প্রভাস ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৯
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ২০২১

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

লেসার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ দশ টাকা

প্রকাশকের কথা

নেতাজি সুভাষচন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৮৪ সালের ২৩ শে জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪পরগণার জয়নগরে আয়োজিত এক জনসভায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সাধারণ সম্পাদক (তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য) কমরেড প্রভাস ঘোষ 'নেতাজির জীবনসংগ্রাম এবং ছাত্রযুবকদের কর্তব্য' সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। ১৯৮৯ সালে আলোচনাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। 'ইতিহাসের কষ্টিপাথরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু' নামে আলোচনাটি পুনরায় প্রকাশ করা হয় জানুয়ারি ২০২০ সালে। প্রকাশের সময় কমরেড প্রভাস ঘোষ কিছু সংযোজন করেছিলেন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে পুস্তিকাটি প্রকাশের জন্য নানা মহল থেকে অনুরোধ আসতে থাকে। এর প্রেক্ষিতে পুনরায় পুস্তিকাটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রকাশের সময় কমরেড প্রভাস ঘোষ আরও কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন। বর্তমানে **'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু'** এই নামে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হল।

অমিতাভ চ্যাটার্জী
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

জানুয়ারি, ২০২১
কলকাতা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

আজ আমরা এখানে যাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য সমবেত হয়েছি — এমন একটা দিন ছিল যেদিন স্বদেশী আন্দোলনের এই মহান বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্রের উদাত্ত আহ্বানে সমগ্র ভারতবর্ষের ছাত্র-যুব সম্প্রদায় হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে, ঘরবাড়ি, বাবা-মায়ের চোখের জল, স্নেহের বন্ধন সব কিছু পিছনে রেখে, ডিগ্রির মোহ, চাকরির প্রয়োজন, ব্যক্তিস্বার্থ, লাভ-লোভ সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পুলিশী আক্রমণ, নির্যাতন, মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এ দেশের জনগণের সামনে, ছাত্র-যুব সমাজের সামনে এই বিপ্লবী নায়ক সে-যুগে বারবার বলতেন — ভিক্ষা করে, আবেদন-নিবেদন করে, আপসের পথে সংস্কারের পথে পরাধীনতার বন্ধন কখনও ছিন্ন করা যায় না, স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতে হয়। এর জন্য দিতে হয় রক্ত, দিতে হয় প্রাণ, এর জন্য সর্বস্ব দিতে হয়। এই কণ্ঠস্বর, এই আহ্বান একদিন প্রদেশে প্রদেশে, শহরে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হত। লক্ষ লক্ষ ছাত্র-যুবক এই বক্তব্যকে স্মরণ করে অনুপ্রাণিত হত, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হত।

আপনারা জানেন, আমি এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতাদর্শ মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার একজন ছাত্র, এ দেশের সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের একজন সৈনিকমাত্র। এই আমার পরিচয়। এই পরিচয়েই আপনারা আজকের এই সমাবেশে কিছু বলার জন্য আমাকে ডেকেছেন। মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একজন ছাত্র হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা দিয়ে নেতাজিকে যেভাবে বুঝেছি, তাই-ই আমি আজ আপনাদের সামনে রেখে যাচ্ছি। এই সমাবেশে দাঁড়িয়ে আমাদের ছোটবেলার কথা, ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনের গৌরবোজ্জল যুগের শেষ অধ্যায়ের কথা মনে পড়ে। সে যুগের লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো আমাদের শৈশব-কৈশোরের দিনগুলির কথা স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেদিন মায়েদের কোলে বসে আমরা অনেকেই শুনতাম সেই বিখ্যাত গানটি, 'একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি'! কে লিখেছে, কে সুর দিয়েছে, কেউ জানে না। কিন্তু সেদিন ঘরে ঘরে হাজার হাজার অশ্রুসজল মায়েদের আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে এই গানটি ছিল। জীবনপ্রভাতে এইভাবে ক্ষুদিরামের নামটি আমাদের বুকে চিহ্নিত হয়ে যেত। শুনতাম বড়দের মুখে, হাটে, গঞ্জে, চারণকবি মুকুন্দদাসের উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান — 'দশ হাজার প্রাণ আমি যদি পেতাম, ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি অতল

জলে ডুবিয়ে দিতাম'। আরও শুনতাম বড়দের চাপাকণ্ঠে ফিসফিস করে আলোচনা, নেতাজির দেশত্যাগ, বিদেশে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গঠন, ইংরাজের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের কথা, কবে তিনি এদেশে আসবেন, দেশ স্বাধীন করবেন — এই নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা। তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে আজ আসবেন, কাল আসবেন — এসব ভেবে রোমাঞ্চিত হতাম। এইসব নিয়েই শৈশব-কৈশোরে, জীবনের সেই স্তরেই জীবনের আদর্শ হিসাবে এদেশের আরো অনেকের মতোই আমার জীবনে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু, লালা লাজপত, নেতাজি, ভগৎ সিং, নজরুল এঁরা সব এসে গিয়েছিলেন। পারি না পারি এঁদের মতো হওয়ার স্বপ্ন সকলেই দেখতাম। আর এই স্বপ্ন ছিল বলেই একদিন নিতান্ত আকস্মিকভাবে যখন এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে আসি, যিনি এদেশের কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের চোখের জল, বুকের ব্যথাকে নিজের বুকে বহন করে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং-এর অপূর্ণ স্বপ্নকে পূর্ণ করার জন্য মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে এই হাতিয়ারকে আরও উন্নত ও ক্ষুরধার করে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন, তখন তাঁর শিক্ষা, আদর্শ ও চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হই, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হই। মহান বিপ্লবী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন সে যুগের এইসব বড় মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে, এঁদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে, এঁদের কাছ থেকে যা শিক্ষণীয় তার সব কিছু নেওয়ার পর সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের জন্য আরও এগিয়ে যেতে। তাই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আপনাদের সাথে সম্মিলিতভাবে স্বদেশী আন্দোলনের যুগের এই বিপ্লবী নায়কের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে এসেছি। আমি জানি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র দেশের জন্য যা মূল্য দেওয়ার তা দিয়েছেন। আজ আর তাঁর দেওয়ার কিছু নেই, আজ তাঁর কাছ থেকে আমাদের নিতে হবে। তাই আজ তাঁর জন্মজয়ন্তী পালন করতে গিয়ে যদি আমরা কিছু মাল্যদান, মামুলি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, বক্তৃতা, ভাষণ-এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করি তাহলে বলব, নাই বা হল এই অনুষ্ঠান, নাই বা হল এই প্রহসন। যদি আমরা এই মানুষটির প্রাণের কথা, বুকের ব্যথাকে আমাদের বুকে বহন না করি, তাঁর সংগ্রামী চরিত্র থেকে উপযুক্ত শিক্ষা না নিই এবং যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি আজীবন লড়ে গেলেন সেই স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যা কর্তব্য সেটাকে নির্ধারণ করে তাকেই একমাত্র জীবনব্রত হিসাবে গ্রহণ না করি, তাহলে এই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কোন অর্থ থাকে কি?

নেতাজির জীবন থেকে, তাঁর জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষণীয় বহু দিক আছে। তার দু-একটি দিকের কথা আজ আমি প্রথমে আপনাদের বলব। আমরা সকলে ছোটবেলা থেকে শুনছি, আমাদের ছাত্রজীবন থেকে শুনে এসেছি, আজ যারা ছাত্র তারাও সকলে শুনছে, প্রায়ই অভিভাবকরা শিক্ষকরা উপদেশ দিয়ে থাকেন, শুভাকাঙ্খীরা বলে থাকেন, ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয়, ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। ছাত্রজীবনে এসব নিয়ে মাতামাতি করা উচিত নয়। কেউ কেউ আর একটু এগিয়ে বলেন, লেখাপড়া

করে পাশ-টাশ করে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও, তারপর যা ভাল বোঝ কর। এখন এসব ব্যাপারে জড়িয়ে গেলে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। এসব কথা বহুদিন ধরে চলতে চলতে, শুনতে শুনতে, অনেকের কাছে প্রায় ধ্রুবসত্য হয়ে গিয়েছে। যেন এ নিয়ে আর প্রশ্ন করাই যায় না। আর নেতাজি এ সম্পর্কে কী বলেছিলেন? আমি জানি, শুনলে অনেকেই চমকে উঠবেন। নেতাজি বলেছিলেন, "অধ্যয়নই ছাত্রজীবনের তপস্যা, এই বচনের দোহাই দিয়ে ছাত্রদের দেশের কাজ থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা অনেকেই করে থাকেন। অধ্যয়ন কোনদিন তপস্যা হতে পারে না। অধ্যয়ন মানে হল কতকগুলি গ্রন্থপাঠ ও কতকগুলি পরীক্ষা পাশ — এর দ্বারা মানুষ হয়ত স্বর্ণ পদক লাভ করতে পারে, হয়ত বড় চাকরি পেতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না।" (১) একথাই বলেছিলেন একদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র এদেশের ছাত্রসমাজকে। তাহলে কোন পথে মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গিয়েছেন নেতাজি তাঁর সমগ্র জীবনসংগ্রাম দিয়ে। সে যুগের আরও অসংখ্য যুবকের মতই নেতাজির জীবনে ছিল দুই জন বড় মানুষের প্রথমে বিদ্যাসাগর ও পরে বিবেকানন্দের মূল্যবান শিক্ষা। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিত সাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।" বিবেকানন্দ একদিন এদেশের শিক্ষিত সমাজকে বলেছিলেন, "শুধু পাশ করলেই, শুধু ডিগ্রি অর্জন করলেই শিক্ষিত বলে? যে শিক্ষা মানুষকে সাহস দেয় না, বীর্য দেয় না — সে আবার কিসের শিক্ষা?" (২) তিনি আরও বলেছিলেন, "যতদিন দেশের কোটি কোটি মানুষ অনাহারে ও অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে ততদিন তাদের চোখের জল আর রক্তের বিনিময়ে যারা উচ্চশিক্ষা অর্জন করল, তারা যদি এই দারিদ্র্য-নিপীড়িত মানুষের প্রতি দায়িত্বের কথা ভাববার এক মুহূর্তও সময় না পায়, আমি বলব তারা বিশ্বাসঘাতক, আমি বলব তারা দেশদ্রোহী।" (৩) সে যুগের আরও বহু যুবকের মতো এই কথাগুলি নেতাজিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই স্বদেশী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে পারিবারিক বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, বাবা-মায়ের চোখের জল, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ভর্ৎসনা এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসতে এতটুকু ইতস্তত করেননি। আমরা সকলেই জানি, সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁর মা-বাবা তাঁকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন আই সি এস পরীক্ষায় বসা এবং পাশ করার জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর বুকে পরাধীনতার জ্বালা জ্বলছে। তাঁর বিবেকের সামনে এসে গিয়েছে বিদ্যাসাগরের মূল্যবান শিক্ষা ও অসাধারণ জীবন সংগ্রাম, বিবেকানন্দের আহ্বান, দেশবন্ধুর অতুলনীয় স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত, ক্ষুদিরাম ও অন্যান্য শহিদদের স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত, আপসহীন বিপ্লবাত্মক সাংস্কৃতিক ধারার প্রতিনিধি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের গভীর আবেদন — এসব নিয়েই সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনের মননজগৎ গড়ে উঠেছিল।

একদিকে ভাবছেন স্বদেশী আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বেন,

১ - নূতনের সন্ধানে; ২, ৩ - বাণী ও রচনা

অন্যদিকে অধিকাংশ ভাল ছেলেমেয়ের মতই ভাবছেন — 'বাবা-মায়ের অবাধ্য হব? মা-বাবাকে ব্যথা দেব?' এই দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়েই তিনি বিলাতে পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু আই সি এস পড়তে পড়তেই পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে না বেরোতেই মন স্থির করে ফেলেন — 'না, কোনমতেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের গোলামি করা চলে না।' স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন — আই সি এস ডিগ্রি দু'পায়ে মাড়িয়ে স্বদেশী আন্দোলনে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করবেন।

সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব সহজ ছিল না। কারণ, ছোটবেলা থেকেই তিনি বাবা-মা'কে দেবতার মত শ্রদ্ধা করতেন। কোন প্রশ্নেই তাঁদের অমতে যাবেন ভাবেননি। সেজন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাঁর নিজের ভিতরেও অনেক লড়াই করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, "এভাবে বাবা-মা'র অবাধ্য হওয়া আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। এবং তাঁদের আঘাত দেব ভাবতেই পারতাম না। ... আমি দ্রুত বদলে যাচ্ছিলাম এবং বাবা-মা'কে সন্তুষ্ট করতে ভয় পাব ঠিক এরকম সুবোধ বালক আর ছিলাম না। আমি একটা নূতন আদর্শ পেয়েছিলাম, যা আমার বিবেককে প্রজ্জ্বলিত করেছিল।"[৪] এই আদর্শের জোরেই তিনি বাবা-মা'র চোখের জল, অনুরোধ-শাসনের সাথে লড়াই করেছিলেন। কারণ, এই সিদ্ধান্ত তিনি যখন নিচ্ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন তাঁর মনে এসেছিল — এ নিয়ে বাড়িতে ঝড় উঠবে, বাবা-মা ব্যথা পাবেন, ক্ষুব্ধ হবেন, তাঁরা অনেক আক্ষেপ করবেন, কিন্তু তবুও নীতির প্রশ্নে, সত্যের প্রশ্নে আপস করা যায় না। পৃথিবীর সমস্ত যুগের সমস্ত বড় মানুষের মতোই সুভাষচন্দ্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দাসত্ব ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রামকে, সত্য ও ন্যায়ের পথকে বাবা-মা'র চোখের জল ও কল্যাণ কামনার চেয়েও অনেক বড় মূল্য দিয়েছেন বলেই তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হিসাবে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। 'বাবা-মা আমার জন্য কতকিছু করেছেন, কত ভালবাসেন, কত আশা নিয়ে মুখ চেয়ে আছেন। তাঁদের দুঃখ দিয়ে সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসা কি উচিত? তাঁদের প্রতি কি দায়িত্ব কর্তব্য নেই?' অধিকাংশ ভাল ছেলেমেয়েদের মত এই প্রচলিত যুক্তির পথ বেয়ে চললে নেতাজি আজ ইতিহাসে কোথায় থাকতেন? কোটি কোটি শৃঙ্খলিত, শোষিত ভারতবাসীর চোখের জলের মূল্য দেব, না বাবা-মা'র চোখের জলের মূল্য দেব, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধুর আবেদনে সাড়া দেব, না বাবা-মা'র ভালবাসার আবেদনে সাড়া দেব — কোন্ পথ যথার্থ সত্যের পথ, মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ, সার্থকতার পথ, এই প্রশ্ন সুভাষচন্দ্রের জীবনে এসেছিল। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দুর্বলতার শিকার হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেননি। আর ভুল করেননি বলেই তিনি এত বড় হতে পেরেছিলেন। যদি এই ক্ষেত্রে তিনি দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে আপস করতেন, বাবা-মায়ের দুঃখের কথা ভেবে আই সি এস-এর চাকরি গ্রহণ করতেন, বাড়ি, গাড়ি, বিপুল অর্থ আরও অনেক কিছু — যা হিসেবিদের চোখে

অনেক বেশি মূল্যবান — এসবের অনেক কিছুই পেতেন, কিন্তু বাস্তবে ইংরেজদের গোলাম হিসাবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতেন। আমরা কেউ তাঁর নাম জানতাম না, আজকের এই সভায় সমবেত হয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধায় এ নাম উচ্চারণ করতাম না।

দুইটি ঘটনা নেতাজিকে সংগ্রামী জীবন গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি যখন কটক রেভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের নিম্ন শ্রেণির ছাত্র, সেই কৈশোরেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বেণীমাধব দাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ১১ই আগস্ট শহিদ ক্ষুদিরাম স্মরণ দিবস পালন করেছিলেন সহপাঠীদের একত্রিত করে। সম্ভবত ভারতবর্ষে ঐ প্রথম এই দিবসটি উদযাপিত হয়। ফলে ঐ বয়সেই ক্ষুদিরামের আত্মাহুতি তাঁর বিবেকে গভীর ছাপ ফেলেছিল। আর একটি ঘটনা তিনি নিজেই পরবর্তীকালে ব্যক্ত করেছিলেন। "... বিশেষ কোন একটা মুহূর্তে ক্ষুদ্র একটা ঘটনা আমাদের জীবনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে যেতে পারে। কলকাতায় আমাদের বাড়ির সম্মুখে বসে এক জবুথবু বৃদ্ধা ভিখারি মহিলা প্রতিদিন ভিক্ষা করত। যতবার আমি বাইরে যেতাম বা বাড়ি ফিরতাম তাকে না দেখে পারতাম না। যখনই তাকে দেখতাম বা এমনকি তার কথা চিন্তা করতাম তার করুণ মুখখানি আর তার ছিন্ন বস্ত্র আমাকে যন্ত্রণা দিত। পাশাপাশি নিজেকে এতো সচ্ছল ও সুখী মনে হতো যে আমি অপরাধী বোধ করতাম।...এরকম চিন্তা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল।"[৫] সকল যুগের সকল বড় মানুষেরা, মহান বিপ্লবীরা, শোষিত মানুষের চোখের জল ও বেদনাকে বুকে বহন করেই সংগ্রামের পথে এগিয়েছিলেন। সেজন্যই সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, "বিপ্লবী রাজনীতি এক উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি।"

মহান আদর্শকে জীবনে গ্রহণ এবং তার জন্য সংগ্রাম না করলে যথার্থ মানুষ হওয়া যায় না

আজকাল মানুষ হওয়া বলতে দাঁড়িয়ে গেছে — বড় ডিগ্রি, বড় চাকরি, বাড়ি-গাড়ি, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স; এগুলো দেখলেই লোকে বলে, 'দেখতো, অমুকে কী রকম মানুষের মত মানুষ হয়েছে। কোনও ঝুট-ঝামেলায় থাকে না, একে ধরে তাকে ধরে নিজেরটা বেশ গুছিয়ে নিতে জানে।' এমন কথা অনেক শিক্ষক, অভিভাবক, আত্মীয়, বন্ধুর মুখে মুখে। আর নেতাজী বলছেন, "মহান আদর্শকে যে ভালবাসে না, সে ব্যক্তি কোন দিনও মানুষ হতে পারবে না।"[৬] অর্থাৎ মানুষ হতে হলে চাই জীবনে মহৎ আদর্শ, যে আদর্শ সত্যের সন্ধান দেয়, সমাজ ও সভ্যতার মুক্তির প্রয়োজনে কর্তব্য পথের সন্ধান দেয়, সেই আদর্শকে ভালবাসতে হবে, জীবনের ব্রত হিসাবে নিতে হবে। এখনকার দিনে চোখের সামনে অন্যায়, অত্যাচার হচ্ছে দেখেও অনেকে বলেন, অনেক শিক্ষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীরাও নিঃসঙ্কোচে বলে থাকেন, 'বুঝি তো সব, কিন্তু কী করব

৫ - নূতনের সন্ধানে; ৬ - রচনাবলী : প্রথম খণ্ড

বলুন, আমাদের হাত-পা বাঁধা, ঘর-সংসার আছে, চাকরি-বাকরি আছে, প্রতিবাদ করলে নানা ঝামেলায় পড়তে হবে, নানা বিপদ-আপদ হবে, সেজন্য বুঝেও কিছু করতে পারছি না।' আর একদল বলেন, 'যার ঘরে খাবার আছে তারই এসব পোষায়।' আবার কেউ বলেন, 'এসব করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়লে আমাদের দেখবে কে?' — এইসব যুক্তি তুলে এরা সব দেখেও চোখ বুজে থাকেন। এতটুকু বিবেক দংশন অনুভব করেন না। আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।" এই মহৎ উক্তি করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বোঝাননি যে আমি ছাত্র, আমার বাবা-মা দুঃখ পাবে, বা আমার ঘরে খুব অভাব, অথবা আমাদের দেখবে কে — এইসব যুক্তি যারা তোলে তারা চোখের সামনে অন্যায় দেখেও চুপ করে থাকলেও তাদের কোন অপরাধবোধ হবে না। বরং বলেছেন, 'আমি তো করিনি, অমুকে অন্যায় করেছে — একথা বলেও তোমার নিস্তার নেই। কোনও কারণে, কোনও অজুহাত দেখিয়ে, কোনও অসুবিধার দোহাই দিয়ে অন্যায় সহ্য করলে তুমিও অন্যায়কারীর মতই সমানভাবে ঘৃণার পাত্র।' আর যারা নানা দোহাই দিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না, তাদের সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "অত্যাচার দেখেও যে ব্যক্তি নিবারণ করার চেষ্টা করে না, সে নিজের মনুষ্যত্বের অপমান করে, অত্যাচারিত ব্যক্তির মনুষ্যত্বেরও অপমান করে।"[৭] তিনি বলেছেন, "একথা ভুলোনা, অন্যায় আর মিথ্যার সাথে আপস করার মত নিকৃষ্টতম অপরাধ আর নেই।"[৮] অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে জেল হাজত, লাঠি-গুলি, অত্যাচার সবই সহ্য করতে হয়, তা সত্ত্বেও কেন লড়ব, এই প্রশ্নের জবাবে নেতাজি বলেছেন, "যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপন্ন হয়, কারারুদ্ধ হয় অথবা লাঞ্ছিত হয়, সে সেই ত্যাগ ও লজ্জার ভিতর দিয়ে মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৯] তিনি আরও বলেছেন, "তুমি যদি জীবন পেতে চাও, তাহলে প্রয়োজনে জীবন দিতে হবে। মানে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজনে মৃত্যুও বরণ করতে হবে। তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একথাও বলেছেন, "স্কুলে-কলেজে, ঘরে বাইরে, পথে-ঘাটে, যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে, সেখানে বীরের মতো অগ্রসর হইয়া বাধা দাও।...আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে শক্তি যদি কিছু সংগ্রহ করিয়া থাকি তা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।"[১০] সেই যুগের অন্যান্য বড় মানুষদের মূল্যবান বাণী ছাড়াও নেতাজির এইসব আবেদনগুলি গ্রামে-শহরে, স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে অনুপ্রাণিত করত, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করত, দেশের মুক্তি সংগ্রাম 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' গণ্য করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত। 'ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান' গেয়ে মৃত্যুভয়কে হাসি মুখে পরাস্ত করত। আজ সেই দিনগুলি কোথায় হারিয়ে গেল! কেন গেল, এর উত্তর খোঁজা ও সমাজের সংগ্রামের মধ্যেই রয়েছে নেতাজি জয়ন্তী উদ্‌যাপনের সার্থকতা।

আজও আমরা কেউ কেউ যখন দেশের নানা সম্যসার কথা শুনি, নানা শোষণ-

৭, ৯, ১০ - নূতনের সন্ধানে; ৮ - Political Testament

অত্যাচারের সম্পর্কে শুনি, তখন বিবেকে ধাক্কা দেয়। ভাবি কিছু করা উচিত। আবার পরক্ষণেই মন দুর্বল হয়ে যায়। বাবা-মা ব্যথা পাবেন, তাদের কী বলব, আবার ঝুটঝামেলায় জড়াব, আমার ফিউচার নষ্ট হবে — এইসব ভেবে পিছিয়ে যাই। নেতাজির এই সংগ্রাম থেকে, সমস্ত যুগের সমস্ত বড় মানুষদের থেকে এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের নিতে হবে।

আপনারা জানেন, আজকাল সকলেই চোখের সামনে দেখছেন, এখনকার ছাত্রযুবকদের কাছে দেশের কাজ করা, রাজনীতি করার মানে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত ধান্দা, সুযোগসুবিধা আদায়। কোন্ দলে গেলে, কার খাতায় নাম লেখালে, কার হয়ে ইলেক্শনে নামলে কী পাব — এই হচ্ছে এখনকার মূল মন্ত্র। কেন্দ্র ও রাজ্যের মসনদে যাঁরা বসে আছেন তারা এই মন্ত্রেই ছাত্রযুবকদের দু'বেলা দীক্ষা দিচ্ছেন, যা দেখে একদিন কমরেড শিবদাস ঘোষ দুঃখ করে বলেছিলেন, 'এখনকার পার্টিগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ। অভাব অনটনে মানুষের দিন চলছে না, সেই সুযোগ নিয়ে চাকরিবাকরি, লাইসেন্স, টাকাপয়সার লোভলালসা জাগিয়ে দলের কাজকর্ম করিয়ে নিচ্ছে।' কেউ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে রাজনৈতিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন, বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে - দূর তুই একটা বোকা, এমন একটা পার্টি করছিস যার কোন ফিউচার নেই। এ দল করে তোর কী হবে? গার্জেনরা পর্যন্ত উপদেশ দেন, 'রাজনীতি যখন করছিস, এমন একটা দল কর যেখানে গেলে নিজের কিছু হবে। দ্যাখ তো, অমুকে কীরকম চালাক চতুর, পার্টি করে কেমন নিজেরটা গুছিয়ে নিল।' এই হচ্ছে আজকের যুগের চিন্তাভাবনা। তার ফলে রাজনীতিরও যা পরিণতি হওয়ার তাই হয়েছে। সেদিন রাজনীতিতে মানুষ আসত দেওয়ার জন্য, আজ আসছে নেওয়ার জন্য। কমরেড শিবদাস ঘোষ একদিন বলেছিলেন, "বিপ্লবী আন্দোলন এবং লড়াই যারা গড়ে তোলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা লড়াই শুরু করে, প্রথমে তাদের দিতে হয় বেশি, মরতে হয় বেশি, ত্যাগ করতে হয় বেশি। ... এই মানসিকতার ভিত্তিতেই সব দেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং বিপ্লবী আন্দোলনের জমি তৈরি হয়েছে। এইভাবেই একটি একটি ইট গেঁথে বিপ্লবীরা বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করেছে, তবে বিপ্লব হয়েছে।"[১১] নেতাজির যুগে ছাত্রযুবকদের মানসিকতা ছিল এইরকমই। আর ছিল বলেই তারা সর্বস্ব পণ করে স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাদের সামনে ছিল সে যুগের বিপ্লবী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মূল্যবান শিক্ষা, "দেশসেবা শুধু কথার কথা নয়, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। একদিকে আমি, আর একদিকে দেশ। মাঝখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, অর্থপ্রাপ্তি নেই, নাম যশের আকাঙ্খাও নেই। দেশের জন্য অকাতরে যে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে তাকেই তো দেশসেবক বলে।"[১২] সুভাষচন্দ্ররা, সে যুগের বিপ্লবী যোদ্ধারা এই শিক্ষাকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র ডিগ্রি, চাকরি, ঘরবাড়ি পিতামাতার চোখের জল সব কিছু উপেক্ষা করে

১১ - ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলন ও ছাত্রদের কর্তব্য, শিবদাস ঘোষ রচনাবলী- ৩য় খণ্ড

১২ - দেশসেবা, শরৎ রচনাবলি- ৫ম খণ্ড

বেরিয়ে এসে এদেশের ছাত্রযুবশক্তির কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব।' তিনি নিজে শুধু রক্তই দেন নি, দেশের মুক্তিযজ্ঞে সর্বস্ব দিয়ে গেছেন। তাঁর এই মহান জীবন থেকে যদি আজ আমরা কোনও শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারি, দেশের কাজ, রাজনীতি করা — এইসব প্রশ্নে যদি তার থেকে শিক্ষা না নিতে পারি কীভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থকে হাসিমুখে ত্যাগ করতে হয়, কিছু পাওয়ার জন্য নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বস্ব দেওয়ার জন্যই রাজনৈতিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা — এ যদি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে না পারি, তাহলে বৃথা এই ২৩ জানুয়ারি উদ্‌যাপন, বৃথাই এই অনুষ্ঠান।

সঠিক মতাদর্শ, সঠিক পথ ও উন্নত নৈতিক মানই সমস্ত যুগের বড় মানুষদের শক্তির প্রকৃত উৎস

আর একটা কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, আপনারাও অনেকে অনেক সময় বলে থাকেন, 'ওরা কি পারবে, ওদের হাতে কি পাওয়ার আছে? এমনকি যে দল বা নেতার বক্তব্য আপনাদের ভাল লাগে, চরিত্র আপনাদের মুগ্ধ করে, তাদের সম্পর্কেও অনেক সময় বলে থাকেন, এ দলের নীতি আদর্শ ঠিক, এদের ছেলেমেয়েগুলো ভদ্র-নম্র, এদের ডিসিপ্লিন আছে, কিন্তু এরা কি পারবে? এদের কি পাওয়ার আছে?' এখানে পাওয়ার বলতে বোঝানো হয় — মন্ত্রীত্ব আছে কিনা, এমএলএ, এমপি আছে কিনা, থানাপুলিশ, টাকার জোর, মারপিটের গুণ্ডাবাহিনী এসব আছে কিনা, মিথ্যা বুঝিয়ে বা টাকা দিয়ে, সুযোগসুবিধা দিয়ে হলেও দলে লোক বেশি কিনা, দল ভারী কিনা, খবরের কাগজে, টিভিতে এদের প্রচার আছে কিনা। রাজনীতিতে পাওয়ার বলতে অর্থাৎ শক্তি বলতে বিজেপি, কংগ্রেস, আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলি এমনকি সিপিএম-ও আজ এটাই দাঁড় করিয়েছে এবং আপনারাও ওদের প্রচারের জোরে শুনতে শুনতে বিভ্রান্ত হয়ে এরকমই ভাবতে শুরু করেছেন — এটাই সবচেয়ে ট্র্যাজিক। অথচ সুভাষচন্দ্ররা, সে যুগের স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীরা যখন রাজনীতিতে আসতেন, নেতা ও দল নির্বাচন করতেন, তখন পাওয়ার বলতে এরকম বুঝতেন না। সমস্ত যুগের বড় মানুষরা, মানব ইতিহাসের মহান সন্তানেরা — যাঁরাই তাঁর তাঁর যুগের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁরা কোন্ পাওয়ারের ভিত্তিতে লড়েছেন? বুদ্ধ হন, যীশুখ্রীষ্ট হন, শঙ্করাচার্য-চৈতন্য হন এঁরা সকলেই একাকী শুরু করেছিলেন, অশেষ দুঃখ কষ্ট নির্যাতন বরণ করেছিলেন। কিন্তু একথা কেউই বলেননি— আমি পারব এইজন্য যে আমার পক্ষে রাষ্ট্রশক্তি আছে, সৈন্যবাহিনী আছে, অর্থের শক্তি আছে, গায়ের জোরের দাপট আছে। বলেছিলেন— আমরা পারব, কারণ আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জন্য লড়ছি, সত্যের জন্য লড়ছি। এই সত্যই ছিল তাঁদের শক্তির উৎস। এই হচ্ছে সমস্ত যুগের সমস্ত বড় মানুষের জীবনের মূল মন্ত্র। ইউরোপে যারা একদিন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঝাণ্ডা, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ঝাণ্ডা, রেনেশাঁর ঝাণ্ডা বহন করেছিলেন, তারাও সত্যের শক্তিতেই নূতন যুগের নূতন সত্যের উপলব্ধির

ভিত্তিতেই লড়েছিলেন। ইতিহাসে দেখা গেছে — প্রগতির সংগ্রামে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে প্রথম দিকে দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে কেউ আসে না। আসে মুষ্টিমেয়। আসে তারাই যারা হাসিমুখে সমস্ত অত্যাচার-অবিচার সহ্য করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঝাণ্ডা বহন করার মত সাহস রাখে, তেজ রাখে। এই জন্যই একদিন ভারতবর্ষের নবজাগরণের পথপ্রদর্শক রামমোহন রায় বলেছিলেন, ''It is a tragedy in history that truth always starts with minority.'' সেই নবজাগরণের সংগ্রামী যুগের আর একজন মহান যোদ্ধা বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একাকী অবস্থায় ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তাঁর এই একাকীত্বের অবস্থা বলতে গিয়ে তিনি একদিন বলেছিলেন, 'স্বদেশে আমি নির্বাসিত।' এঁরা কি ইতিহাসে কিছু করতে পেরেছিলেন? আর যদি পেরে থাকেন, সেটা কয়টা মন্ত্রীত্ব, এমএলএ-এমপির জোরে পেরেছিলেন? যে মহান মার্কসবাদ নিয়ে বিশ্বে ঝড় উঠেছে, সেই মার্কসের মৃত্যুর সময় তাঁর শয্যার পাশে কতজন ছিল? ক'জন সেদিন তাঁকে চিনত, জানত? কোন্ শক্তির জোরে মার্কসবাদ আজ গোটা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যিনি সফল করেছিলেন, সেই লেনিনও একদিন যখন মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে শুরু করেছিলেন, বিরোধী পক্ষ ঠাট্টা করে বলেছিল, 'এই ক'টা লোক নিয়ে কী করবে?' সেই সময় লেনিনের বিখ্যাত উক্তি, ''Better fewer, but better.'' বলেছিলেন, ''The question is not of number, the question is of the correct expression of revolutionary politics of the proletariat.'' ঠিক এই কথাই আর এক ভাষায় চীন বিপ্লবের মহান নেতা কমরেড মাও সে তুঙের কণ্ঠে শুনি, ''The correctness or incorrectness of the ideological-political line decides everything.'' তিনি বলেছিলেন, 'এত বড় বিরাট দেশে আমি বারো জন নিয়ে শুরু করেছিলাম, তার মধ্যে ছয়জন মনোবল ভেঙে যাওয়ায় সরে যায়, চারজন শত্রুপক্ষের আক্রমণে প্রাণ হারায়। আজ দল বিরাট, শক্তি অনেক, বিপ্লব সফল — সেই প্রথম বারোজনের দুইজন এখন আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু এইসব অগ্রগতি ঘটেছে সঠিক নীতি, আদর্শের জন্যই, বিপ্লবের সঠিক লাইনের জন্যই। আবার যদি দল এখন বিপ্লবী লাইনচ্যুত হয়, আদর্শচ্যুত হয়, সব তাসের ঘরের মত ভেঙে যাবে।' আমাদের নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষও একদিন শত শত শহিদের অপূর্ণ স্বপ্নকে সফল করার জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে একটি যথার্থ সর্বহারা দল গড়ে তুলেছিলেন, বিরুদ্ধ পক্ষের নিন্দা, কুৎসা, অপপ্রচার, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, প্রবল বিরুদ্ধতা, সবকিছুকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ একাকী লড়েছিলেন, সেই সময় একদল তাঁকে বলেছিল, 'আপনার বক্তব্য ঠিক, যুক্তি আছে, সত্য আছে, কিন্তু আপনি পারবেন না। এতবড় বিশাল দেশ, ভারতবর্ষে কত নামকরা নেতা, কত নামকরা দল, সেখানে আপনার কোন ডিগ্রি নেই, সঙ্গিসাথী নেই, অর্থ নেই, সংবাদ মাধ্যমের ব্যাকিং নেই, এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের, চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্বও আপনাকে সমর্থন করে না, করে তাদের যাদের আপনি বলছেন মেকি কমিউনিস্ট, এরকম অবস্থায় আপনি একা কী

করবেন? মিছিমিছি আপনার ভবিষ্যৎ, ক্যারিয়ার নষ্ট হবে, আপনি এ পথ ছেড়ে দিন।' সেদিন তিনি দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি এদেশের কোটি কোটি শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য যে বিপ্লবী আদর্শকে সত্য বলে বুঝেছি, সেই আদর্শের জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে যাব। আমাকে গুলি করা যেতে পারে, আমি না খেয়ে মরতে পারি, কিন্তু আমি নিজের বিবেককে বিক্রি করতে পারব না। সত্যভ্রষ্ট হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী? আমি গাছতলায় আছি, হয়তো গাছতলাতেই মরব, কিন্তু মরব মাথা উচু করে, ভাবব, ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রয়োজনে এই মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। সত্য থাকলে একদিন ইতিহাস তার মূল্য দেবে।'

একটা দল পারবে কি পারবে না, একটা দলের যথার্থ শক্তি কী, এইসব প্রশ্নে তিনি বলতেন, "মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক লাইন ভুল হলে সাংগঠনিক ক্ষমতা ও শক্তি যতই থাকুক, তার দ্বারা শুধু অনিষ্ট সাধনই হবে ... মতাদর্শ ও রাজনৈতিক লাইন সঠিক হলে শক্তি আজ যতই কম থাকুক, সেই দলই ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে একদিন বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারবে।"[১৩] তিনি আরও বলতেন, 'বিপ্লবী রাজনীতির প্রাণ উন্নত চরিত্রের মান। একটা দল দেখতে বড়, কিন্তু তার নেতা ও কর্মীদের উন্নত চরিত্রের মান নেই, মানে প্রাণ নেই, তাহলে সে তো শবদেহ, গোটা পরিবেশকে সে বিষাক্ত করে তুলবে।' তিনি বলতেন, "যে কোন আদর্শ, যে কোন দর্শন, যে কোন বড় মতবাদের আসল মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার নৈতিক মান এবং সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানের মধ্যে।"[১৪] তাহলে একটা দল যথার্থই সমাজমুক্তি আনতে পারবে কিনা, মানুষের যথার্থ কল্যাণ করতে পারবে কিনা, কী দিয়ে তার বিচার হবে? কী সেই দলের পাওয়ারের উৎস? সবযুগের সব বড় মানুষেরাই দেখিয়ে গেছেন, সেই শক্তির উৎস সঠিক আদর্শ, সঠিক নীতি ও উন্নত চরিত্রের মান।

দেশ ও সমাজমুক্তির সংগ্রামে যাঁরা আত্মনিয়োগ করবেন, তাঁদের যে প্রথম দিকে দেশের মানুষই চিনবে না, শুনবে না, সমর্থন তো দূরের কথা, বিরুদ্ধতা করে বসবে, তখন যে কাপুরুষের মতো পালিয়ে না গিয়ে সম্পূর্ণ একাকী দিনের পর দিন লড়তে হবে, এবং তার জন্য যে সাহস চাই, এই শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুভাষচন্দ্র একদিন বলেছিলেন, "দেশের ভবিষ্যতের অমঙ্গলের পথ রুদ্ধ করে তার প্রতিবিধান আপনারা করতে চাইলেও হয়তো জনসাধারণ আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে না। তখন বন্ধুবিহীন অবস্থায় একাকী দাঁড়িয়ে সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো সাহস আপনাদের মনে জাগরূক হওয়া চাই।"[১৫] যারা সমাজ পাল্টাবেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন, ইতিহাস গড়বেন, তাঁদের শুধু যে শোষকশ্রেণির অত্যাচার, নিপীড়ন সহ্য করতে হয় তাই নয়, বিভ্রান্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের নিন্দা-গ্লানিও সহ্য করতে হয়, এই দিকটা তুলে ধরে তিনি বলেছেন, "ইতিহাস সৃষ্টি করতে হলে আমাদের বহু বিরোধিতা ও অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

১৩- সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে, শিবদাস ঘোষ রচনাবলি- ৩য় খণ্ড; ১৪- বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধ প্রসঙ্গে, শিবদাস ঘোষ রচনাবলি-৪র্থ খণ্ড; ১৫- নূতনের সন্ধানে

অত্যন্ত নিঃস্বার্থ কাজের জন্যও নিন্দা ও বিদ্রুপ, নিকটতম বন্ধুর কাছ থেকে ঈর্ষা ও শত্রুতা লাভ — এতেও আশ্চর্য হলে চলবে না।"[১৬] ফলে যে কোনভাবে 'খ্যাতি চাই, পপুলারিটি চাই, যে পাবলিকের জন্য এত করছি তারাই যখন বুঝল না, তখন এইসব করে লাভ কি, বরং যেদিকে হাওয়া সেই দিকে যাওয়াই ভাল' — এইসব ভাবলে যে বড় কাজ হয় না, ইতিহাস পাল্টানো যায় না, একথাই নেতাজি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, "জনপ্রিয়তার স্রোতে যে চিরদিন ভেসে থাকতে চায় সে হয়তো সাময়িকভাবে জনসাধারণের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু ইতিহাসে সে অমর হতে পারে না। ভবিষ্যতের ইতিহাস সে সৃষ্টি করতে পারে না।"[১৭] বিপ্লবী আন্দোলনে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনেক অত্যাচার-বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু কীভাবে এগুলিকে দেখব, বিপ্লবী জীবনে এগুলির মূল্য কী, এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "আঘাত, বিপদ আছে বলেই তো জীবনের মূল্য আছে — ত্যাগ, শোক, অত্যাচার না থাকলে জীবনের কি কোন সৌন্দর্য, কোন বৈচিত্র্য থাকত?"[১৮]

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গান্ধীবাদীদের বিরুদ্ধে নেতাজি যখন লড়ছেন, গান্ধীবাদীদের ষড়যন্ত্রে তিনি যখন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন, নির্জন নিশীথে একটিমাত্র সঙ্গী নিয়ে তিনি যখন গৃহত্যাগ করে বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথে পাড়ি দিলেন, তখনও অন্য কিছু নয়, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, জ্বলন্ত দেশপ্রেম এটাই ছিল তাঁর শক্তির উৎস। এই সত্যের জন্য, আদর্শের জন্য একজন জীবনও দিতে পারে, কিন্তু সে আত্মদান যে ব্যর্থ হয় না, আরও বহুজনকে আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করে বৃহত্তর সংগ্রামের জন্ম দেয় — এই শিক্ষা দিয়ে তিনি একদিন বলেছিলেন, 'আদর্শের জন্য একজন ব্যক্তির মৃত্যুও হতে পারে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেও সে আদর্শ বেঁচে থাকবে, আরও সহস্র জীবনের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে।' আজ ২৩ জানুয়ারি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে যদি এই শিক্ষাগুলি না গ্রহণ করতে পারি, তাহলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হবে না, হবে আত্মপ্রবঞ্চনা।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, অনেকে অনেক সময় বলে থাকেন, 'সকলে চেষ্টা করলেই কি নেতাজি হতে পারে?' সকলের দ্বারা সব কাজ হয় না। প্রতিভা, ক্ষমতা জন্মগত। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে নেতাজি কী বলেছিলেন? তিনি একদিন ছাত্রদের বলেছিলেন, "তোমরা হয়তো মনে কর, মহাপুরুষেরা বড় হয়েই জন্মান, তাঁদের চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে বা সাধনা করে বড় হতে হয় না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ... যত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের জীবনী যদি বিশ্লেষণ কর তাহলে দেখবে যে, প্রত্যেকের জীবনে আছে অসীম অধ্যবসায়, অক্লান্ত চেষ্টা, একনিষ্ঠ সাধনা ও অবিরাম পরিশ্রম। তোমরা যদি তেমন করে চেষ্টা ও সাধনা করতে পারো তাহলে তোমরাও একদিন মহাপুরুষের আসনে বসতে পারবে।"[১৯] এই প্রশ্নে একদিন কমরেড শিবদাস ঘোষও বলেছিলেন, "মানুষের গুণাবলী আকাশ থেকে পড়ে না, সেগুলি একটা সংগ্রামের ফল। যাঁরা মনে করেন,

১৬- নূতনের সন্ধানে ১৭, ১৮ - নূতনের সন্ধানে; ১৯ - সুভাষ রচনাবলী ঃ ৩য় খণ্ড

প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা এগুলি জন্মগত — আমি তাদের সাথে একমত নই। আমার মতে সামাজিক যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ জন্ম নেয়, সেই পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটে। ... সেখানে একজন মানুষ কেমন করে কীভাবে সংগ্রাম করে, কোন আদর্শ-নীতি ও কোন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কতটা যোগ্যতার সাথে সে তার সংগ্রাম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়, তারই উপর নির্ভর করে সেই মানুষটি জীবনে কেমন রূপ নিয়ে গড়ে উঠবে। তাই প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা — এগুলি হচ্ছে এক একটি বিশেষ ধরনের সংগ্রামের ফল।"[২০] নেতাজিও তাঁর যুগে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সে যুগের স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে সংগ্রাম পরিচালনা করেই একজন বড় মানুষ হতে পেরেছিলেন। নেতাজির জীবন থেকে এ শিক্ষাও আমাদের নিতে হবে।

নেতাজির বিরুদ্ধে গান্ধীবাদীদের জঘন্য ষড়যন্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়

এবার আমি আপনাদের কাছে স্বদেশী আন্দোলনে নেতাজির ভূমিকা ও তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে কয়েকটি দিক তুলে ধরব। আপনারা জানেন, আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে রাজনৈতিক আন্দোলনে দুটি ধারা ছিল। একটি ছিল — আপসের পথে, সংস্কারের পথে, আবেদন-নিবেদন, গোলটেবিল বৈঠকের পথে, দর কষাকষি করে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করা। আর একটি ধারা ছিল — ভিক্ষা করে নয়, আবেদন-নিবেদন, আপসের পথে নয়, সশস্ত্র সংগ্রামের পথে, রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা অর্জন। প্রথম ধারার প্রতিনিধি ছিলেন গান্ধীজি, আর দ্বিতীয় ধারার প্রতিনিধি ছিলেন নেতাজি। প্রথম ধারা ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে, যারা শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল, আর দ্বিতীয় ধারা ছিল সংগ্রামী মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। আপনারা জানেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বারবারই এই দুই ধারার মধ্যে, দুই নেতৃত্বের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটেছে, তীব্র সংঘাত বেধেছে। অবশ্য সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক মঞ্চে আসার আগেই এদেশে সশস্ত্র বিপ্লববাদ ছিল। এই বিপ্লবীরা আত্মাহুতি দিয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু মূলত নানা দলে, গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের মাধ্যমেই প্রথম বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধভাবে আপসকামীদের বিকল্প আপসহীন নতুন বিপ্লবী নেতৃত্বের জন্ম দেয়। এইক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা ঐতিহাসিক। এই বিপ্লবীদের জয় সূচিত করেই প্রথম সুভাষ বোস হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। তখন অবশ্য গান্ধীবাদীরা অনেকেই তেমন বাধা দেননি। তাঁরা আশা করেছিলেন, পদের লোভে, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার লোভে সুভাষচন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লবী লাইন পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু তাঁরা নিরাশ হলেন। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে

২০ - শিবদাস ঘোষ রচনাবলি- ৩য় খণ্ড

সুভাষচন্দ্রের ভাষণ তাঁদের আতঙ্কিত করে তুলল। আতঙ্কিত করে তুলল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও। তখন ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধ আগতপ্রায়। সুভাষচন্দ্র আহ্বান জানালেন, "এই বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করতে হবে।" তিনি বললেন, "অন্য সময়ে লড়তে গেলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত সামরিক শক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু এখন নানা ফ্রন্টে লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকার দরুণ তার পক্ষে সমস্ত শক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। শত্রুর এই দুর্বল মুহূর্তেই তাকে আঘাত করে পরাস্ত করা সবচেয়ে সহজ।"[২১] এছাড়া তিনি ঘোষণা করলেন, "কংগ্রেসের প্রথম লক্ষ্য দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন, পরের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা; শ্রমিক ও কৃষকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল করতে হবে, জমিদারী প্রথার অবসান করতে হবে।" তাছাড়া ঐখানে ঘোষণা করলেন, "যখন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র চলছে তখন একটিমাত্র দেশ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন দাঁড়িয়ে আছে—যার অস্তিত্ব সাম্রাজ্যবাদীদের বুকে কাঁপন ধরায়।"[২২] এই সব ঘোষণা আগে কখনও জাতীয় কংগ্রেস করেনি। ফলে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় পুঁজিবাদ ও গান্ধীবাদী নেতৃত্ব। এরা সকলেই চাইলো সুভাষ বোসের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে হবে, কোনক্রমেই যাতে পরবর্তী ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্কালে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত না হন। এরপর শুরু হয়ে গেল স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগের এক ঘৃণ্য কলঙ্কজনক অধ্যায়। গান্ধীবাদীরা সুভাষ বোসের বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন পট্টভি সীতারামাইয়াকে। সকলেই জানতেন, পট্টভি হচ্ছেন গান্ধীজির প্রার্থী। শুধু তাই নয়, নেহেরু-প্যাটেল সহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জাঁদরেল গান্ধীবাদী সদস্যরা ওয়ার্কিং কমিটির কোন বৈঠক না করে, প্রেসিডেন্টের কোন অনুমোদন না নিয়ে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ও নিয়ম লঙঘন করে সুভাষ বোসের বিরুদ্ধে পট্টভি সীতারামাইয়াকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যম তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার চালাল। কিন্তু এত করেও ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হলেন না। বিপ্লবী শক্তির জয় হল। সুভাষ বোস সভাপতির পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন। পরাজিত হয়ে গান্ধীজি এমনকি সৌজন্যের রীতিও লঙঘন করে বলে ফেললেন, "পট্টভির পরাজয় আমার পরাজয়। সুভাষ বোসকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। হাজার হোক সুভাষ বোস তো দেশের শত্রু নন।"[২৩] এই হচ্ছে পরাজিত গান্ধীজির অভিনন্দনের ভাষা। গান্ধীজি কতটা ক্ষিপ্ত হয়েছেন, এতে বোঝা যায়। এরপর ওয়ার্কিং কমিটির গান্ধীবাদী সদস্যরা আরও কুৎসিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। সুভাষ বোস গুরুতর অসুস্থ জেনেও তারা তাঁর অনুপস্থিতিতে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডাকলেন এবং সুভাষচন্দ্র তাঁর অসুস্থতার কথা জানিয়ে মিটিংটা কয়েকদিন পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করায় প্রত্যুত্তরে তারা একযোগে পদত্যাগের হুমকি দিলেন। মানে তারা সুভাষ বোসকে যেভাবে হোক কোণঠাসা করবেনই। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তো প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বলে বসলেন, 'কংগ্রেসের এই সঙ্কট সৃষ্টির জন্য সুভাষ বোসই দায়ী।' যেন সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসের

২১, ২২ ঃ ক্রশরোডস্ ; ২৩ ঃ সুভাষচন্দ্র ভাবমূর্তিতে ও ইতিহাসে — গৌর অধিকারী

সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়াটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ। নেতাজির বিরুদ্ধে গান্ধীবাদীরা যে কতদূর জঘন্য কাজ করেছিলেন তার অন্যতম নজির হচ্ছে, সে সময় নেতাজির গুরুতর অসুস্থতা সম্পর্কেও তাদের নানা কুৎসা রটনা। তারা বললেন, 'সুভাষ বোসের আসলে কিছু হয়নি, এটা তার পলিটিক্যাল ফিভার।' এই কথাটা এতদূর প্রচার হয়েছিল যে ত্রিপুরী কংগ্রেসের রিসেপশন কমিটির ডাক্তাররা অধিবেশনের আগের দিন যখন তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলেন, সত্যিই তাঁর হাই টেম্পারেচার, এতটুকুও উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, তখন তাঁরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এতেও নেহেরু, প্যাটেলদের সন্দেহ দূর হয়নি। ডাক্তাররা নিজেরা থার্মোমিটার দেখেছিলেন কিনা, এই প্রশ্নও নাকি তারা তুলেছিলেন। অথচ তাঁকে স্ট্রেচারে আনতে হয়। আজকাল যেসব ছাত্রযুবকেরা একদিকে নেতাজির ছবিতে মালা দেয়, আর একদিকে কংগ্রেস জিন্দাবাদ শ্লোগান তোলে, তাদের অতীতের এইসব ঘটনাগুলো স্মরণ করতে বলি। কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রকে কোণঠাসা করার জন্য কীভাবে একটার পর একটা এই ধরনের কুৎসিত ষড়যন্ত্র করেছিলেন — এগুলি ভেবে দেখতে বলি। এই অধিবেশনেই অসুস্থ শরীরে সুভাষচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় গভীর উদ্বেগে বলেছিলেন, "ইতালি ও জার্মানির সাথে হাত মিলিয়ে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন সোভিয়েত রাশিয়াকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করছে।"[২৪] এই কথায় তিনি পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে কী গভীর আবেগ প্রকাশ করেছিলেন।

গান্ধীবাদীরা কৌশল নিলেন— হয় তারা সুভাষ বোসের সমস্ত ক্ষমতা খর্ব করে ঠুঁটো জগন্নাথের মত তাঁকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে রাখবেন, আর না হয় তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করবেন। এই উদ্দেশ্যে আনা হল গান্ধীবাদী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ কর্তৃক কুখ্যাত প্রস্তাব। এতদিন কংগ্রেসের সংবিধানের নিয়ম ছিল, কংগ্রেস প্রেসিডেন্টই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মনোনীত করবেন। এই অধিবেশনে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ প্রস্তাব আনলেন, এখন থেকে যিনি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হবেন, তিনি গান্ধীজির অনুমোদন নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মনোনীত করবেন। মানে এককথায়, প্রেসিডেন্ট যিনিই হন না কেন, গান্ধীবাদীদের দখলে ওয়ার্কিং কমিটিকে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে গান্ধীজির অনুমোদন নিতে হবে। ফলে প্রেসিডেন্টের কার্যত কোন ক্ষমতাই থাকবে না। শুধু গান্ধীবাদীরাই যে এই প্রস্তাব আনলেন তাই নয়, সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই যে, গান্ধীবাদীরা যখন ষড়যন্ত্র করে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন, তখন একদিকে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (সি এস পি)-র নেতারা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে পন্থ প্রস্তাবের পক্ষে দাঁড়ালেন, অপরদিকে এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে মার্কসবাদী বলে পরিচিত অধুনা সিপিআই, সিপিএম, সিপিআই(এম-এল) সহ নানা উপদলে বিভক্ত তৎকালীন সময়ের অবিভক্ত সিপিআই নেতৃত্ব চরম সুবিধাবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতার

২৪ ঃ ক্রশরোডস্ ;

পরিচয় দিয়ে সুভাষ বোসের পক্ষে না দাঁড়িয়ে নিরপেক্ষ(!) থেকে গান্ধীবাদীদের জয়যুক্ত হতে সাহায্য করলেন। পন্থ প্রস্তাব গৃহীত হল, সুভাষ বোসরা পরাজিত হলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের এই ট্র্যাজিক অধ্যায় সম্পর্কে নেতাজি কী ব্যথায় বলেছিলেন, "ত্রিপুরীতে সত্যিই আমাদের পরাজয় হয়। কিন্তু... এটা হচ্ছে ১) কংগ্রেসের বারোজন প্রবীণ বাঘা বাঘা নেতা, ২) জহরলাল নেহেরু, ৩) সাতজন প্রাদেশিক মন্ত্রী, ৪) মহাত্মা গান্ধীর নাম, প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে একজন অসুস্থ শয্যাশায়ী মানুষের সংগ্রামেরই দৃষ্টান্ত।"[২৫] নেহেরুর ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "এই সঙ্কটের সময় ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং আমাদের আদর্শের নেহেরু যত ক্ষতি করেছিলেন আর কেউ তা করেনি। ... উপরোক্ত বারোজন যা করেছেন, নেহেরু আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রোপাগান্ডা করে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করেছেন।"[২৬] তাছাড়া এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে তিনি যাদের উপর বিশ্বাস করে ঠকেছিলেন সেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও অবিভক্ত সিপিআই-এর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে দুঃখ করে বলেছিলেন, "আমাদের পরাজয়ের আর একটা কারণ ছিল সিএসপি নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা ... আর কমিউনিস্ট পার্টিও তাদের সাথে হাত মিলিয়েছিল।"[২৭] বামপন্থার নামে এদের সুবিধাবাদী চরিত্র সম্পর্কে তিনি সেদিন মন্তব্য করেছিলেন, "বামপন্থীদের মত কথা বলা আর দক্ষিণপন্থীদের মত কাজ করা ... সুবিধাবাদের সম্ভবত প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।"[২৮]

পন্থ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে কংগ্রেসে দেখা দিল নূতন সঙ্কট। গান্ধীজি ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে কোন মতামত দিতে রাজি হলেন না। আবার পন্থ প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁর অনুমোদন ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা যাচ্ছিল না। কংগ্রেসের কাজকর্মে অচলাবস্থা দেখা দিল। নেহেরুরা এর জন্য সুভাষ বোসকেই দায়ী করতে লাগলো। এই অবস্থাতেই সঙ্কট এড়ানোর জন্য সুভাষ বোস বারবার গান্ধীজিকে হস্তক্ষেপ করতে আবেদন জানালেন। কিন্তু গান্ধীজি নানা যুক্তি ও কাজের অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেলেন। জিনিসটা এত নোংরা, কুৎসিত হয়ে দেখা দিল যে এমনকি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি রাজনৈতিক প্রশ্নে গান্ধীজির অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনিও ক্ষুব্ধ না হয়ে পারলেন না। তিনিও গান্ধীজিকে হস্তক্ষেপ করার জন্য আবেদন জানালেন। কিন্তু গান্ধীজি একইভাবে এড়িয়ে গেলেন। এরপর সুভাষ বোসের পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। এবং গান্ধীবাদীরাও তা-ই চাইছিলেন। কলকাতা শহরের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সেই ঐতিহাসিক এ আই সি সি অধিবেশনে সুভাষ বোস যখন পদত্যাগপত্র পড়ছিলেন, তখন বাইরে লক্ষ লক্ষ সমবেত বিক্ষুব্ধ জনগণের স্লোগান চলছে — সুভাষ বোস জিন্দাবাদ ; আর চলছে গান্ধীবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ধ্বনি। ভয়ে ষড়যন্ত্রের নায়ক গান্ধীবাদীরা অধিবেশন শেষে বাইরে আসতে সাহস পাচ্ছিলেন না। সুভাষচন্দ্র বোস নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সকলকে সসম্মানে ফিরে যেতে সাহায্য করলেন। তাঁর পরিবর্তে নবনির্বাচিত সভাপতি গান্ধীবাদী রাজেন্দ্র প্রসাদকে সাদরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সুভাষ বোসের প্রতি

২৫ ঃ অমিয়নাথ বসুকে লেখা চিঠি ২৬, ২৭, ২৮ ঃ ক্রুশরোডস্

এত অবিচার, এত অভদ্রতা, কুৎসিত আচরণের মধ্যেও তাঁর ধৈর্য, সৌজন্যবোধ, তেজ এবং দৃঢ়তা দেখে রবীন্দ্রনাথ সেদিন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দনবাণী পাঠিয়ে 'দেশনায়ক' বলে সম্বোধন করলেন। কিন্তু গান্ধীবাদীদের আক্রমণ এইখানেই শেষ হল না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের ডাক দেওয়া চলবে না। আর সেইসময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন, এই অপরাধে তাঁকে কংগ্রেস সদস্যপদ থেকে সাসপেন্ড করা হয়, কার্যত বহিষ্কার করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনারও প্রতিবাদ করলেন, গান্ধীজিকে পুনরায় জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে হস্তক্ষেপের আবেদন জানালেন। গান্ধীজি তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে জানালেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলতে চান না, তিনি বলতে পারেন না। আর রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন, রবীন্দ্রনাথ যেন সুভাষ বোসকে বলেন যাতে তিনি ডিসিপ্লিন মেনে চলতে শেখেন। এই সময়েই গান্ধীজি অ্যান্ড্রুজকে বলেছিলেন, 'সুভাষ বোস ইজ এ স্পয়েল্ড চাইল্ড'। মানে গান্ধীজির বিচারে সুভাষ বোস ইনডিসিপ্লিনড এবং স্পয়েল্ড। এই সময়ের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস পর্যন্ত লিখলেন, "গান্ধী তাঁর অসহযোগ অস্ত্রটি এইসময় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসের সভাপতির (অর্থাৎ সুভাষ বোসের) বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন।"[২৯] সুভাষ বোসকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হল। আজ যাঁরা কংগ্রেসের ঝাণ্ডা বহন করছেন, একই মঞ্চে গান্ধীজি, নেহেরু, ইন্দিরা ও নেতাজির ছবি স্থাপন করছেন, তাদেরও বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভ্রান্ত ছাত্রযুব শক্তিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের এই কলঙ্কজনক অধ্যায়টি স্মরণ করতে বলি।

স্বাধীনতা আন্দোলনে পুঁজিপতিশ্রেণি নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই নেতাজির বিরুদ্ধে গান্ধিবাদীদের এই হীন ষড়যন্ত্র

নেতাজিকে কেন এভাবে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল, কেন তাঁর আন্দোলনের কর্মসূচির বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হল, এ সম্পর্কে নেতাজি নিজেই বলেছেন, "তাঁদের (অর্থাৎ গান্ধীবাদীদের) আশঙ্কা, একবার দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে, জাতীয় আন্দোলনের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ এবং নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই কংগ্রেস থেকে সমস্ত বামপন্থীদের বের করে দেওয়ার এই হীন প্রচেষ্টা।"[৩০] বলেছেন, "তাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল যেকোন ভাবে হোক সংগ্রামকে এড়িয়ে যাও, যতটুকু ক্ষমতা হাতে এসে গিয়েছে তাকে আঁকড়ে ধরে রেখে আরও ক্ষমতার জন্য রুদ্ধদ্বার বৈঠক আর আলোচনা চালিয়ে যাও।"[৩১] এই হচ্ছে সেদিনকার গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতাদের সম্পর্কে নেতাজির বিশ্লেষণ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে গান্ধীজি, নেতাজির বিরুদ্ধে এই ধরনের আঘাত হানলেন কেন? এটা কি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ? এটা কি নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব? আমরা তা মনে করি না। এই

২৯ ঃ The Last years of British Rule in India ; ৩০, ৩১ ঃ ক্রুশরোডস্

গান্ধীবাদীরা যে শোষকশ্রেণির স্বার্থেই তাঁর বিরুদ্ধে এই আক্রমণ করেছেন, এটা বুঝেছিলেন বলেই সেদিন নেতাজি বলেছিলেন, ''বাস্তবে পার্টির অভ্যন্তরের এই সংগ্রামের পিছনে রয়েছে শ্রেণি সংগ্রাম।''[৩২]

আমাদের প্রয়াত নেতা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন — গান্ধীজি নিজের অজ্ঞাতসারেই ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণি-স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছিলেন। একটি ছোট্ট কথায় গান্ধীবাদকে অপূর্বভাবে বিশ্লেষণ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ''Gandhism is a sublimatic transformation of bourgeois class instinct, originated through the process of fusion between the senses of bourgeois moral values and the fear complex of revolution of Gandhi.''[৩৩] গান্ধীজি সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান মানতেন না। সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিহাসের নিয়মকে অস্বীকার করেছিলেন, সমাজ যে শ্রেণিবিভক্ত, কোন ব্যক্তি যত বড়ই হন না কেন, সততা, নিষ্ঠা তাঁর যাই থাকুক না কেন, শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে তিনি যে উঠতে পারেন না — এই সত্যকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। আর করেছিলেন বলেই দেশের কল্যাণের নামে তিনি যা কিছু করেছিলেন, যা কিছু ভেবেছিলেন, সব কিছুর দ্বারা তিনি যে শোষিত জনগণের শ্রেণিস্বার্থের চরম ক্ষতি করে জাতীয় পুঁজিবাদের স্বার্থে যা কিছু কল্যাণকর তাই-ই করে গেছেন এটা বুঝতে পারেননি। এখানেই হচ্ছে গান্ধীজির ট্র্যাজেডি। এছাড়া সত্য নির্ধারণে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, তাঁর চিন্তা ঐশ্বরিক শক্তি প্রদত্ত। তাই তিনি বলেছেন, ''My claim to hear the voice of God is no new claim. Unfortunately, there is no way that I know of proving the claim except through results. .... The hearing of the voice was preceded by a terrific struggle within me. Suddenly the voice come upon me. I listened, made certain that it was the voice, and the struggle ceased. I was calm. ... This was between eleven and twelve midnight. I felt refreshed and began to write the note about it which the reader must have seen. ... I have no further evidence to convince the sceptic...but I can say this that not the unanimous verdict of the whole world against me could shake me from the belief that what I heard was a time-voice of God.''[৩৪] তাঁর অবচেতন মনে বুর্জোয়া শ্রেণির সশস্ত্র বিপ্লব বিরোধিতা এমন দৃঢ়ভাবে কাজ করেছিল যে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন তাঁর সশস্ত্র বিপ্লব বিরোধিতা বা non-violence তত্ত্ব ঈশ্বরের বাণী। তাই তিনি এমন কথাও সেই সময় বলেছিলেন যে, ''Of course, my emphasis on non-violence becomes one of principles. Even if I was assured that we could have independence by means of violence I should refuse to have it. ...I base my faith in God and his justice.''[৩৫]

৩২ ঃ ক্রশরোডস্ ৩৩ ঃ গণদাবী, বিশেষ সংখ্যা, ১৫ নভেম্বর, ১৯৪৯ ; ৩৪, ৩৫ ঃ Socialism of My Conception - M K Gandhi

একই দৃষ্টিভঙ্গিতে গান্ধীজি শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম ও শ্রমিক বিপ্লবের বিরোধিতা করে পুঁজিবাদ টিকিয়ে রাখার পক্ষে বলেছিলেন, "ভগবান মালিককেও সৃষ্টি করেছেন, শ্রমিকদেরও সৃষ্টি করেছেন। মালিক হচ্ছে বুদ্ধির শক্তি, আর শ্রমিক হচ্ছে শ্রম শক্তি। ... ধনীর কাছে তার সম্পদ থাকবে, যা থেকে তার নিজের যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন অনুযায়ী সে ব্যবহার করবে। বাকি অংশের ট্রাষ্টি হিসাবে মালিক থাকবে সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য। একজন ব্যক্তি ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়া নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না। ...পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ নেই ...আমি তাদের হৃদয় দ্রবীভূত করতে চাই, যাতে তারা তাদের কম ভাগ্যবান ভাইদের জন্য কিছু ন্যায়সঙ্গত বখরা করে। ফলে আমার কাছে শ্রেণি সংগ্রামের অনিবার্যতা নেই। ...আমাদের সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ হবে অহিংসার ভিত্তিতে এবং মালিকের ও শ্রমিকের, জমিদার ও খাজনাদানকারীদের সম্প্রীতিমূলক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে।"[৩৬] একবার বর্তমান ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখুন, গান্ধীজি কল্পিত দেশের চেহারা কী! গান্ধীজির এই ভূমিকা সম্পর্কে সতর্ক করে সেই সময়েই শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "তাঁর (গান্ধীজির) আসল ভয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে ধণিকরা, বণিকরা।"[৩৭]

নিজের অজ্ঞাতসারে এই পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে গান্ধীজি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন — বিপ্লব ও বিপ্লবীরা ভারতবর্ষের পক্ষে বিপজ্জনক। এই কারণেই একবার তিনি দেশবন্ধু সি আর দাশের বাড়িতে বিপ্লবীদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এরা দেশের শত্রু, ট্রেটর।' সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ করে বললেন, 'আপনার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করছি। ওঁরা দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিচ্ছেন। মত পার্থক্যের জন্য যদি আপনি তাঁদের ট্রেটর বলেন, তাহলে একই যুক্তিতে ওঁরাও আপনাকে ট্রেটর বলতে পারে।' গান্ধীজি শেষ পর্যন্ত তাঁর উক্তি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। শরৎচন্দ্র অরেকদিন গান্ধীজিকে প্রশ্নের উত্তরে জবাব দেন, "attainment of Swaraj can only be achieved by 'soldiers', not by spiders". অর্থাৎ চরকা কেটে স্বরাজ আসবে না, এর জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে। শান্তি ও অহিংসার পথই একমাত্র স্বাধীনতার পথ — বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে গান্ধীজির এই মনোভাবের জন্যই সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ সত্ত্বেও গান্ধীজি ভগৎ সিং-এর ফাঁসির আদেশ প্রত্যাহারের জন্য ইংরেজ সরকারের উপর চাপ দিলেন না। সেই সময় বড় লাটের সাথে গান্ধীজির বৈঠক ছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ভগৎ সিং সম্পর্কে দাবি না মানলে তিনি যেন বৈঠক বয়কট করেন। কিন্তু গান্ধীজি সেটা করলেন না। বরং যেটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যেখানে সকলেই জানতেন, ভগৎ সিং-এর পরিবারের লোকজনও জানতেন তাঁর ফাঁসি হবে ২৪ মার্চ সকালে। কিন্তু ২৪ মার্চ যেহেতু করাচীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হবে, গান্ধীজি ঐ দিন বিক্ষোভের আশঙ্কায় গভর্ণরকে ভগৎ সিংদের

৩৬ ঃ Socialism of My Conception - M K Gandhi ; ৩৭ ঃ শরৎচন্দ্র - বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গে ;

ফাঁসির তারিখ পরিবর্তনের আবেদন জানালেন এবং সেই অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয় ২৩ মার্চ বিকালে ফাঁসি হবে, সে খবর সময় মত জানতে না পারায় তাঁর আত্মীয়রা ও সমর্থকরা কেউই জেল গেটে উপস্থিত হতে পারেননি। যে ভগৎ সিং বীরের মত মাথা উঁচু করে ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দিয়ে গেলেন সেই ভগৎ সিং-এর জন্য যখন সারা দেশের মানুষ চোখের জল ফেলেছে, গান্ধীজি তা দেখে বলেছিলেন, "ভগৎ সিং-পূজা দেশের অপরিমেয় ক্ষতি করছে এবং করেই চলেছে। যেখানেই এই পূজার উন্মাদনা, সেখানেই দেখা যাচ্ছে গুণ্ডামি এবং অধঃপতন।"[৩৮] অথচ সেদিন দেশবাসীর প্রকৃত মনোভাবটি ফুটে উঠেছিল সুভাষচন্দ্রের এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে, "ভগৎ সিং ছিলেন দেশের প্রান্তে প্রান্তে জেগে ওঠা বিদ্রোহ চেতনার মূর্ত প্রতীক, এই চেতনার যে আলোকশিখা জ্বলে উঠেছে, তা অনির্বাণ হয়ে থাকবে।"[৩৯] এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই গান্ধীজি সুভাষ বোসের নেতৃত্বকে আতঙ্কের চোখে দেখেছিলেন। আপনারা জানেন, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনের যুগে জাতীয় স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত হলেও সেদিন ভারতবর্ষ শ্রেণিবিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল টাটা-বিড়লার মত মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণি এবং জোতদারশ্রেণি, শোষকশ্রেণি, অন্যদিকে ছিল অগণিত কোটি কোটি শোষিত শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষক, মধ্যবিত্ত। স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য উভয়ের এক ছিল না, থাকতে পারে না। এ দেশের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণির, শোষকশ্রেণির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনগণের দেশপ্রেমকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে এদেশে নিজেদের শোষণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা, যা আজ তারা করে চলেছে। অন্যদিকে শোষিত জনগণের শ্রেণিস্বার্থ চরিতার্থ হতে পারত বিদেশি ও দেশি সমস্ত রকম শোষণ-অত্যাচারকে উচ্ছেদ করে শ্রেণিশোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা। এই ছিল তাদের স্বার্থে যথার্থ স্বাধীনতার ধারণা। এদেশের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি তার শ্রেণিস্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে গান্ধীজিকে কাজে লাগিয়েছিল। এই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি সশস্ত্র বিপ্লবের তীব্র বিরোধী ছিল, কারণ তাদের কাছে ইতিমধ্যেই বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল যে ১৯১৭ সালে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে রাশিয়ায় পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে তারা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ক্ষমতা করায়ত্ত করতে চাইলেও শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। ফলে কিছুতেই তারা এদেশে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটতে দিতে পারে না। এটা ঘটে গেলে, যে শোষিত জনগণ অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখবে, তারা শুধু সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানই ঘটাবে না, বিপ্লবী চেতনার অধিকারী হয়ে পুঁজিবাদকেও উচ্ছেদ করবে। এই খানেই ছিল বুর্জোয়াশ্রেণির আতঙ্ক। তাই যেভাবে হোক, সশস্ত্র বিপ্লবকে রুখতে হবে। এমনকী সাম্রাজ্যবাদী শাসন অবসানের চেয়েও এটা ছিল তাদের কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই আবেদন-নিবেদন, ধর্না, অহিংসা এসবের পথে যতটুকু ক্ষমতা পাওয়া যায় তাই ভাল, আর এই ক্ষেত্রে গান্ধীজি হলেন তাদের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। এই গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতৃত্বের সম্পর্কে ভগৎ

৩৮ ঃ ওরা আকাশে জাগাতো ঝড় - শৈলেশ দে
৩৯ ঃ ওরা আকাশে জাগাতো ঝড় - শৈলেশ দে

সিংও বলেছিলেন, "কংগ্রেস ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণি ও ব্যবসায়ীদের কিছু অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।"[৪০] কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যেকার বামপন্থী ধারা কর্তৃত্বে এসে গেলে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা হবে না। এই জন্যই পুঁজিবাদের প্রয়োজন ছিল নেতাজিকে কিছুতেই কংগ্রেস নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে না দেওয়া, যেভাবেই হোক তাঁকে নেতৃত্ব থেকে, এমনকি কংগ্রেস থেকেও অপসারিত করা। আর এই পুঁজিবাদের প্রয়োজনেই গান্ধীবাদীরা একটার পর একটা ষড়যন্ত্র করল এবং শেষপর্যন্ত তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিল করল।

তদানীন্তন এই গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতৃত্বের মুখোশ ও শ্রেণিচরিত্র উদঘাটন করে নেতাজি সেদিন বলেছিলেন, "আজকে এদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এমন সব কংগ্রেসী মন্ত্রীদের যারা কংগ্রেস ...মন্ত্রীত্ব দখলের পথে পা বাড়ানোর আগে পর্যন্ত কংগ্রেসবিরোধী ছিল, দেখা যাবে এমন সব লোকদের যারা কোনদিন ব্রিটিশ জেলের ত্রিসীমানার মধ্যেও যায় নি। দেখা যাচ্ছে, কোটিপতিরাও নিজেদের দেশপ্রেমিক বলে জাহির করছে, কারণ তারা নিজেদের গান্ধীবাদী বলছে। ...জমিদার-জোতদার, শিল্পপতি, কোটিপতিরাই ...এখন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ঘিরে রেখেছে...।"[৪১]

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলব। গান্ধীজির আপসমুখী আন্দোলন সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজশক্তির কোন ভয় ছিল না। তারা বুঝতে পেরেছিল, কংগ্রেস নেতৃত্বে গান্ধীজি থাকলে এবং গান্ধীবাদীরা থাকলে তারা নিশ্চিন্ত। বরং সুভাষ বোসদের নিয়েই তাদের আতঙ্ক। তাই ইংরেজ শাসকরাও সেদিন গান্ধীজিকে পরোক্ষে নানাভাবে মদত দিয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হিসাবে জনমানসে ভাবমূর্তি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এদেশের জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণির মত তারাও চেষ্টা চালিয়ে গেছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস এই বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন, "ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল গান্ধীর কাছ থেকে তাদের ভয় পাবার কিছু নেই, কারণ তিনি যে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাবিরোধী একজন সংস্কারক মাত্র এটা তারা ধরতে পেরেছিল। যতক্ষণ গান্ধী কংগ্রেসের কর্ণধার, তারা জানত কংগ্রেসে তাদের একজন বন্ধু রয়েছে। যতক্ষণ তার অসহযোগ আন্দোলন অহিংস থাকছে সরকারের তা নিয়ে বড় একটা মাথাব্যথা ছিল না। ...গান্ধীজির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র সংগ্রাম দাবিয়ে রাখা, সরকারের উদ্দেশ্যও তাই। তাছাড়া ছোটখাটো এক-আধটা সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনা দমন করার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু গান্ধী কংগ্রেস নেতৃত্বে না থাকলে তার এই সংগঠন অনেক বেশি গতিশীল এবং সহিংস আন্দোলনের সমর্থক নেতৃত্বের হাতে চলে যেতে পারে। তখন সর্বাত্মক কোন বিদ্রোহ গড়ে উঠলে তাকে আর দমন করা যেত না, এই কারণেই সরকার গান্ধীর প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করত, যদিও জনচিত্তে তাঁর ভাবমূর্তি অম্লান রাখতে (অর্থাৎ তাকে লোকে যাতে ব্রিটিশের বন্ধু মনে না করে এইজন্য) মাঝেমাঝে তাকে জেলে আটক করত। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীদের যাদের তারা সত্যিই ভয়ের চোখে দেখত তাদের বেলায় অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা

৪০ ঃ বীরেন্দ্র সিন্ধু সম্পাদিত 'যুগস্রষ্টা ভগৎ সিং (হিন্দি) ৪১ ঃ ক্রুশরোডস্ ;

অবলম্বন করত।"[৪২] সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিও একই কারণে সেদিন নেতাজির বিরুদ্ধে গান্ধীবাদীদের ব্যাক করেছে, যা দেখিয়ে নেতাজি মন্তব্য করেছিলেন, "বম্বে (বর্তমানে মুম্বাই) এবং মাদ্রাজের ব্রিটিশ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলিও ...এখন রাতারাতি কংগ্রেস মন্ত্রীসভার মুখপত্র হয়ে গেছে।"[৪৩] ঠিক একই ভাবে আজ ভারতীয় পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যম-টিভি-রেডিও তাদের স্বার্থ রক্ষক বিজেপি, কংগ্রেসের এবং আঞ্চলিক পুঁজিবাদী দলগুলি এমনকি সি পি আই (এম), সি পি আই-কে প্রচার দেয়, অন্যদিকে বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে বর্জন করে চলেছে।

ভারতীয় পুঁজিপতিদের এই বিপ্লবভীতির জন্য জাতীয় কংগ্রেস রামমোহন বিশেষত বিদ্যাসাগর-শরৎচন্দ্রদের অনুসৃত নবজাগরণের আবেদন, সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় কূপমন্ডুক মধ্যযুগীয় চিন্তা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করেনি। গান্ধীজি বৈজ্ঞানিক, সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সর্বধর্মের সমন্বয়ের ভিত্তিতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের এক অভিনব ভাবধারা উপস্থিত করলেন, যা বাস্তবে দাঁড়াল উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলন, যার ফলে মুসলিম জনগণ ও তথাকথিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা মূলত এই স্বাধীনতা আন্দোলনের বাইরেই থেকে গেছে এবং এটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় পুঁজিবাদও চেয়েছে। এরফলে একদিকে যেমন ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত অর্থাৎ সেক্যুলার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এদেশে গড়ে ওঠেনি, অন্যদিকে পুঁজিবাদী জাতীয় অর্থনীতির বিস্তার ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠলেও ধর্ম-জাতপাত-প্রাদেশিকতা-উপজাতিগত-ট্রাইবাল পার্থক্য, বিরোধিতা ও বিদ্বেষ থেকে গেছে যা উস্কানি দিয়ে ভারতীয় পুঁজিবাদের গোলাম ক্ষমতাসীন দলগুলি গণআন্দোলনের ঐক্য ভাঙার জন্য দাঙ্গার আগুন জ্বালায় এবং ভোট ব্যাঙ্ক সৃষ্টির স্বার্থেও ব্যবহার করে। স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের এই ভূমিকার কুফলকে কাজে লাগিয়েই সাম্প্রদায়িক বিজেপি-আর এস এস এবং তার পাল্টা হিসাবে একদল মুসলিম মৌলবাদীরা এতটা মাথা চাড়া দিয়ে দেশে আজ এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পেরেছে। গান্ধীবাদীদের এই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে সুভাষচন্দ্র সেই দিন যথার্থ সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করে বলেছিলেন,"ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ধর্ম ব্যক্তি বিশেষের বিষয় হওয়া উচিত, ব্যক্তি হিসাবে মানুষ যে ধর্ম পছন্দ করে তাহা অনুসরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে, কিন্তু ধর্মীয় কিংবা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়, ইহা পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি দ্বারা।"[৪৪] বলা বাহুল্য গান্ধীজি নেতৃত্ব নেতাজির এই যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেনি। যার পরিণতিতে আজ দেশে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই নেতাজি আজাদ হিন্দ বাহিনীতে ধর্ম যুক্ত করেননি। আবিদ হাসান ও আরও কয়েকজন মিলে আই এন এ-র জন্য সর্বধর্ম সমন্বয়ের আহ্বান জানিয়ে একটি গান রচনা করেছিলেন। নেতাজি বিরক্ত হয়ে

৪২ ঃ The Last years of British Rule in India ৪৩, ৪৪ ঃ ক্রসরোডস্

বললেন, "শোনো, একটা কথা তোমাকে খুব স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি। আমাদের কাজকর্মের সঙ্গে কিছুতেই ধর্মকে মেশাতে দেব না আমি। আমাদের সবকিছুরই একমাত্র ভিত্তি হল জাতীয়তাবাদ। তুমি ওদের ধর্মের নামে এক করতে চাও। তাই যদি হয়, তাহলে একদিন ধর্মের নামে ওরা আবার আলাদা হয়ে যাবে। ওদের জন্য গুরুদ্বার আছে, মসজিদ আছে, মন্দির আছে—যার খুশি সে ওখানে যেতে পারে, কিন্তু যা জাতীয়তাবাদশূন্য, আমার জগতে তার কোন স্থান নেই।"[৪৫]

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই আপসহীন দৃষ্টিভঙ্গি বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় পুজিবাদ ও গান্ধীবাদী নেতৃত্বের কাছে খুবই বিপজ্জনক ছিল। তাই তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিলেন।

অবিভক্ত সিপিআই-ও সেদিন নেতাজির বিরোধিতা করে স্বাধীনতা আন্দোলন তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের চূড়ান্ত ক্ষতি করেছে

কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণি ও গান্ধীবাদীরা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন এবং এই ষড়যন্ত্রকে সাম্রাজ্যবাদীরা যতই মদত দিক না কেন, তা সফল হত না, নেতাজিকে এইভাবে কংগ্রেস দল ও নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করা যেত না, যদি সেদিন এ দেশে একটি যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব বিপ্লবী দল থাকত। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন এ দেশে সে দল ছিল না। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে দাবী করত যে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি যা আজকে টুকরো টুকরো হয়ে সিপিআই, সিপিআই(এম), সিপিআই (এম এল) এবং তার নানা গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে গেছে, তারা মুখে দাবী করলেও তাদের সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমিউনিজমের যথার্থ সম্পর্ক ছিল না। তারা যা কিছু বলেছে এবং করেছে, সবই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী। ফলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে তারা যে পথ নিয়েছিল, তাতে জাতীয় কংগ্রেসে বুর্জোয়া নেতৃত্ব কায়েম হতে কার্যত সাহায্যই করেছে। মার্কসবাদী হিসাবে তখন তাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল, গান্ধীজিকে সামনে রেখে বুর্জোয়া শ্রেণি কংগ্রেসের নেতৃত্ব একচ্ছত্রভাবে দখল করার যে ষড়যন্ত্র করছে তাকে প্রতিহত করা এবং স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবী লাইনকে শক্তিশালী করা। কারণ, তখনকার কংগ্রেস আজকের মতো ছিল না, তখন কংগ্রেস একটা প্ল্যাটফর্মের মতো ছিল। তখন কংগ্রেসে যেমন গান্ধীবাদীরা ছিল, তেমনি সশস্ত্র বিপ্লবীরাও ছিল, মডারেটরা ছিল, আপসহীন যোদ্ধারা ছিল, সমাজতন্ত্রে কমিউনিজমে বিশ্বাস করে এমন লোকেরাও ছিল। সেই সময়েই সুযোগ ছিল গান্ধীবাদীদের বিকল্প হিসাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী ধারাকে সমর্থন করে এবং মজবুত করে বুর্জোয়া নেতৃত্বকে পরাস্ত করে ধীরে ধীরে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করার। যেমনটি করেছিলেন চীন বিপ্লবের মহান নেতা কমরেড মাও সে-তুঙ, যিনি কমিউনিস্টদের নিয়ে কুওমিনটাং দলে থেকে নেতাজির

৪৫ ঃ ক্রসরোডস্

মতো আর একজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বকে সমর্থন জানিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের স্তরেই শ্রমিক বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসমুখী সংস্কারবাদী ধারা ও আপসহীন সংগ্রামী ধারা এই উভয় নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে একটি মার্কসবাদী দলের কি ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল? এই সম্পর্কে ১৯২৫ সালে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের কর্ণধার মহান স্ট্যালিন এক আলোচনায় বলেছিলেন, "ভারতের ন্যায় উপনিবেশে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে জাতীয় বুর্জোয়ারা আপসকামী, ...এই আপসকামী বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে বোঝাপড়া করেছে। বুর্জোয়াদের অতি ধনী ও প্রভাবশালী অংশ দেশের স্বার্থের থেকেও নিজেদের টাকার থলির কথা বেশি ভাবছে এবং সাম্রাজ্যবাদের থেকেও বিপ্লবকে বেশি ভয় পাচ্ছে, ...এরা সম্পূর্ণভাবে বিপ্লববিরোধী শত্রু শিবিরে যাচ্ছে, এরা নিজ দেশে শ্রমিক ও চাষীর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সাথে ব্লক গঠন করছে, এই ব্লককে ধ্বংস করতে না পারলে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা যাবে না। ... এই ধরনের দেশে যেহেতু সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্ব একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারাই সম্ভব, সেইজন্য অগ্রগণ্য কমিউনিস্টদের প্রধান স্লোগান হবে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন অস্তিত্ব। কিন্তু সেই কমিউনিস্ট পার্টি আপসমুখী জাতীয় বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে শহর ও গ্রামের ব্যাপক পেটিবুর্জোয়া জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অবশ্যই বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের সাথে প্রকাশ্যে ব্লক গড়ে তুলবে।"[৪৬] স্ট্যালিনের এই শিক্ষার তাৎপর্য অনুধাবন করে এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য ছিল আলাদাভাবে পার্টির অস্তিত্ব রেখেও কংগ্রেসের ভিতরে ঢুকে আপসমুখী সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী নেতৃত্বকে সাহায্য করা ও তাদের সাথে ঐক্য গড়ে তোলা। আর আমাদের দেশের এই তথাকথিত কমিউনিস্টরা কি করলেন? তাঁরা গান্ধীজির বিরুদ্ধে নেতাজিকে সমর্থন করা তো দূরের কথা, যখন পন্থ প্রস্তাবের দ্বারা নেতাজিকে পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল, সেইসময় নেতাজির পাশে না দাঁড়িয়ে নিরপেক্ষতার ভান করে কার্যত গান্ধীবাদীদেরই অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিকেই সাহায্য করলেন। সেদিন এদেশে স্বদেশী আন্দোলনে এদের নানা ভূমিকা দেখে নেতাজি একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, "কমিউনিজমের বিশ্বজনীন এবং মানবিক আবেদন সত্ত্বেও ভারতে কমিউনিজম বেশি অগ্রগতি করতে পারেনি। প্রধানত এই কারণে যে, তার সমর্থকরা যেসব পদ্ধতি এবং কলাকৌশল অবলম্বন করেছেন, তাতে মানুষকে আকর্ষণ করে বন্ধু ও সহযোগী বানানোর চেয়ে বরং তাকে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে।"[৪৭] নেতাজির এই উক্তি যে কত অক্ষরে অক্ষরে সত্য আজও এদের কার্যকলাপ দেখে তা বোঝা যায়।

এই বক্তব্যের ১৭ বছর বাদে মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে স্বদেশী আন্দোলনে সিপিআইয়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান যে, দল গঠনের পদ্ধতিতে, জীবনদর্শনের

৪৬ ঃ J. V. Stalin Works - Vol-7 ; ৪৭ ঃ ১৯৩১ সালে মথুরায় নওজোয়ান ভারতসভায় ভাষণ

উপলব্ধিতে, আদর্শ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণে, সংস্কৃতি ও নৈতিকতা এবং রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় সিপিআই দলটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি না হয়ে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টি হিসাবে গড়ে উঠেছিল — ঠিক যেমন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দলগুলি, রাশিয়ার মেনশেভিক পার্টি এবং ব্রিটেনের লেবার পার্টি মার্কসবাদের দোহাই দিয়ে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি হিসাবে গড়ে উঠেছিল, যাদের মহান লেনিন শ্রমিক আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের এজেন্ট বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ঠিক এই সোস্যাল ডেমোক্রেটিক চরিত্রের জন্যই সেদিন সি পি আই স্ট্যালিনের গাইড লাইন অনুসরণ করতে পারেনি।

সি পি আই ভেঙে যখন ১৯৬৪ সালে সিপিএম হল, তখনও চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ঐ পার্টিও যে পূর্বতন সিপিআইয়ের মতো একইরকম থেকে গেছে, সেটাও শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ঐক্যবদ্ধ সিপিআইয়ের অধিকাংশ নেতা ও কর্মীরা সৎ হলেও মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত থাকায় স্ট্যালিনের শিক্ষাকে লঙঘন করে মধ্যবিত্ত বিপ্লবী শক্তিকে সহায়তা করার পরিবর্তে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে কার্যত বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতেই সাহায্য করেছেন। আর বর্তমান সময়ে তো সিপিএম এবং সিপিআই-এর অধিকাংশ নেতাদের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের নেতা ও কর্মীদের মতো সততাও নেই। আভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এরা মার্কসবাদের তকমা লাগিয়ে বুর্জোয়া দল কংগ্রেস এবং বিজেপির মতোই গদিসর্বস্ব রাজনীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে আছে, যে রাজ্যে সরকারি ক্ষমতায় আসীন হয়েছে সেখানেই শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে যেভাবেই হোক দেশীয় পুঁজিপতি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের সদা তুষ্ট করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মতো মিথ্যাচার, ভণ্ডামি, প্রতারণার আশ্রয় নিতে এদের এতটুকুও দ্বিধা নেই। ফ্যাসিবাদী কায়দায় গণআন্দোলন দমনে সিপিএম অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মতোই নৃশংস। শুধু তাই নয়, গণআন্দোলন দমনে পুলিশ ছাড়াও সশস্ত্র ক্রিমিনালবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে গণহত্যা ও গণধর্ষণ করানোর মত ঘৃণ্য নজিরও তারা স্থাপন করেছে। ফলে সিপিএমের যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা দেখে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ খুবই তারিফ করে। একদল আবার এই সিপিএমকে দেখিয়ে মার্কসবাদ, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও স্ট্যালিনকে আক্রমণ করছে, যা নেতাজি ও সেই যুগের বড় মানুষরা তৎকালীন সিপিআই-কে দেখে করেননি। অনেকে হয়তো জানেন না, যুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ সরকারের সিঙ্গাপুর বেতার কেন্দ্র থেকে কী গভীর ভরসায় নেতাজি বলেছিলেন, "আজ যদি এমন কোন একজন মাত্র ব্যক্তি থাকেন যাঁহার হাতে আগামী কয়েক দশকের জন্য ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাগ্য ন্যস্ত, তবে তিনি হইলেন মার্শাল স্ট্যালিন। সুতরাং ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করে না করে, তাহার দিকে সর্বাধিক উদ্বেগ লইয়া গোটা বিশ্ব এবং সর্বোপরি গোটা ইউরোপ তাকাইয়া থাকিবে।"[৪৮] একই ভরসায় যুদ্ধ শেষে তিনি

৪৮ ঃ নেতাজি রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড

যে সোভিয়েত ইউনিয়নেই যেতে চেয়েছিলেন, এটা তো আজ সর্বজনবিদিত। দুঃখের কথা, তিনি যেতে পারেননি। যেতে পারলে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণতি নিশ্চয়ই অন্যরকম হত।

মহান স্ট্যালিনের গাইড লাইনের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেছিল সিপিআই

তাহলে এটা পরিষ্কার যে, চীনে ডঃ সান ইয়াৎ সেন, ইন্দোনেশিয়ার ডঃ সোয়েকার্নোর ন্যায় নেতাজিও মার্কসবাদী না হয়েও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা হিসাবে মার্কসবাদ, কমিউনিজম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

আমরা জানি, আজকের যুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদই সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতবাদ। যাঁরাই দেশে দেশে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য লড়বেন, জাতীয়তাবাদী হলেও এই সংগ্রামে তাঁরা কমিউনিস্টদের নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসাবে গণ্য করবেন। সেই জন্যই চীন ও ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক মুক্তি সংগ্রামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান ভূমিকা এবং কমিউনিস্টদের চরিত্র, সততা, নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত কত শত শত জাতীয়াতাবাদীকে অনুপ্রাণিত করেছিল, কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। অথচ আমাদের দেশে স্বদেশী আন্দোলনে এই তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টির অ-মার্কসবাদী কার্যকলাপ ও সুবিধা কিভাবে যে স্বদেশী আন্দোলনে কমিউনিজমের ভূমিকা সম্পর্কে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে বিরূপ ধারণা গড়ে তুলেছিল, সে সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্তকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''আমাদের দেশে যাদের কমিউনিস্ট ভাবা হয়, তাদের কাজকর্ম দেখে আমার মনে হয়েছিল যে কমিউনিজম জাতীয় স্বাধীনতা বিরোধী।''[৪৯] যদিও তিনি এ দেশের তথাকথিত কমিউনিস্টদের দেখে কমিউনিজমকে বুঝতে ভুল করেননি, সেই সম্পর্কেও এই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''আমার আরও বলা উচিত, যে মার্কস-লেনিনের বইপত্রে ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নীতি সংক্রান্ত বিবৃতিতে যেভাবে বলা হয়েছে তাতে আমি সবসময় মনে করতাম ও সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিলাম যে, কমিউনিজম জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং এই সংগ্রামকে তার বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে গণ্য করে।''[৫০] আমাদের দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অ-বিভক্ত সিপিআই-কে দেখে ও আজকের সিপিআই, সিপিআই(এম), সিপিআই (এম এল)-কে দেখে যারা উগ্র কমিউনিজম বিরোধী হয়েছেন, তাদের নেতাজির এই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে বলি। কারণ তিনি এদেশের সিপিআইয়ের কার্যকলাপ দেখে কমিউনিজমকে ভুল বোঝেননি।

এই দেশের তথাকথিত কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ নেতাজির চেয়ে আর কাকে বেশি আঘাত করতে পারে? কিন্তু এর দ্বারা তিনি কমিউনিজমকে ভুল বোঝেননি বা

৪৯, ৫০ ঃ সুভাষ রচনাবলি - ২য় খণ্ড ;

কমিউনিজম বিরোধী হননি। কমিউনিজমকে তিনি বিচার করেছেন ও বুঝেছেন কমিউনিজমের মহান চিন্তানায়কদের বক্তব্য পড়ে, এই সব ভণ্ড কমিউনিস্টদের দেখে নয়। শুধু তাই নয়, নিজে মার্কসবাদী না হয়েও সে যুগের স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লববাদের চর্চা করতে করতে সুভাষচন্দ্র এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গুরুত্ব কতটা বুঝেছিলেন সেটা বোঝা যায় তাঁর একটি ঐতিহাসিক উক্তিতে, যেখানে তিনি বলেছেন, "এটা সাধারণভাবে বোঝা যাচ্ছিল যে, কংগ্রেসের ভেতরে যে সমস্ত প্রগতিশীল, র‍্যাডিক্যাল এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি এখনই সোস্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করতে প্রস্তুত নয়, তাদের নিয়ে একটা ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে তোলা দরকার। আমি আরও বুঝেছিলাম, একমাত্র এইভাবেই দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ ঠেকানো যেত এবং একটা মার্কসবাদী দল গড়ে ওঠার জমি প্রস্তুত করা যেত।"[৫১] অর্থাৎ তিনি এ দেশে একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল গড়ে ওঠার জমি প্রস্তুত করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কারণ সচেতন উপলব্ধিতেই তিনি বলেছিলেন, "ঊনবিংশ শতকে জার্মানির বিশ্ব সভ্যতায় উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে মার্কসীয় দর্শন এবং বিংশ শতকে রাশিয়া সর্বহারা বিপ্লব, সর্বহারা সরকার ও সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।"[৫২] বিশ্বে কমিউনিজমের জয়যাত্রা সম্পর্কে কত আশা ব্যক্ত করে তিনি বলেছিলেন, "বিশ্বের বর্তমান অবস্থায় অসংখ্য স্রোত ও প্রতিস্রোতকে দু'টি প্রধান বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিপরীত স্রোতে ধাবমান কমিউনিজমের শক্তিগুলি, সেইজন্য হিটলারবাদের অবসানের অর্থ কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা"[৫৩] যে মানুষটি এতদূর পর্যন্ত ভাবতে পেরেছিলেন এবং বলতে পেরেছিলেন, তাঁকে এ দেশের তথাকথিত কমিউনিস্টরা সমর্থন তো করলেনই না, বরং বিরোধিতা করে তাঁকে কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করতে বুর্জোয়া শ্রেণি ও গান্ধীবাদীদের সাহায্য করলেন। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে? সেদিন যদি এদেশে যথার্থ একটি মার্কসবাদী দল ও নেতৃত্ব থাকত এবং তার সংস্পর্শে যদি নেতাজি আসতেন তা হলে নেতাজির ভূমিকা এ দেশের ইতিহাসে কী হতে পারত এ কথা আজ বারবার মনে হয়, আর বারবারই আক্ষেপ হয় আমরা দেশবাসী কি সুযোগ হারালাম।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, সেদিন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে এবং নেতাজির পক্ষে সচেতন শ্রমিক শ্রেণির সমর্থন গড়ে তোলবার মতো কোনও দল ছিলনা। নেতাজির সমর্থনে শুধু ছিল মধ্যবিত্ত ছাত্র-যুব সম্প্রদায়। আর আপনারা জানেন, এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন অস্থির, দোদুল্যমান, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ফলে এ দেশে নেতাজির নেতৃত্ব স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারল না। কংগ্রেস সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হবার পর, কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হবার পর, এ দেশে থেকে যখন তিনি আর কিছু করতে পারছিলেন না, তখন

৫২ ঃ ১৯৩৩ লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল কন্‌ফারেন্সে ভাষণ ; ৫১, ৫৩ ঃ ক্রশরোডস্

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বিদেশ থেকে কিছু করা যায় কি না, এই স্বপ্ন নিয়ে একদিন তিনি কিভাবে বিপদসঙ্কুল পথে পাড়ি দিয়েছিলেন, তা আপনারা সকলেই জানেন, যা ইতিহাসে এক কিংবদন্তী হয়ে আছে।

নেতাজির বিদেশ যাওয়া, বিদেশে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করে দেশ স্বাধীন করার প্রয়াস সম্পর্কেও আপনারা জানেন, শুধু গান্ধীবাদীরাই নয়, এমনকি তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতারাও কত ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছে, তাঁর চরিত্রে কত কলঙ্ক আরোপ করার চেষ্টা করেছে। নেতাজিকে 'ফ্যাসিস্টের দালাল', 'কুইসলিং', এইভাবে অভিহিত করে পণ্ডিত জওহরলাল বলেছিলেন, 'সুভাষচন্দ্র দেশে এলে আমি তাকে তলোয়ার দিয়ে অভ্যর্থনা জানাব।' আর তথাকথিত কমিউনিস্টরা বলেছিলেন, 'সুভাষচন্দ্রকে আমরা বুলেটের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাব।' তাদের এই মনোভাবই ফুটে উঠেছিল তৎকালীন সিপিআই এবং পরে সিপিএম-এর নেতা বি টি রণদিভের এক উক্তিতে, "সুভাষ বোস এক বার্তায় অরাজকতা সৃষ্টি এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপকে 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' বলে ভূষিত করেছে। ...জাপানি সাম্রাজ্যবাদের দালাল সুভাষ বোস'কে 'কমিউনিস্ট পার্টি' সেই জবাবই দেবে যা সৎ দেশপ্রেমিকরা বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহীদের দিয়ে থাকেন। ভারতের মাটিতে পা দিয়ে লুটপাট ও ডাকাতির চেষ্টা চালালে বোসের ভাড়াটে 'মুক্তি বাহিনী', চুরি-ডাকাতির বাহিনী তাদের উপর আমাদের রাগ ও ঘৃণা কতখানি টের পাবে।"[৫৪] অর্থাৎ ওঁদের চিন্তায় ওঁরা হচ্ছেন সৎ দেশপ্রেমিক, আর নেতাজি হচ্ছেন বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী! আর তাঁর বাহিনী আজাদ হিন্দ্ ফৌজ হচ্ছে চুরি-ডাকাতির বাহিনী! এখানেই তাঁরা ক্ষান্ত থাকেননি, কুরুচির সকল সীমা ছাড়িয়ে তাঁরা দলীয় মুখপত্রে কার্টুনও ছেপেছিলেন, যেখানে দেখানো হয়েছিল, গলায় শেকল বাঁধা একটি কুকুর, যার মুখটি নেতাজির আর শেকলটি হাতে ধরে আছে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজো। নোংরামির এমন দৃষ্টান্তই রেখেছিলেন এদেশের তথাকথিত কমিউনিস্টরা। এখানেও বুর্জোয়াদের, গান্ধীবাদীদের আর তথাকথিত কমিউনিস্টদের সুরের ঐক্য লক্ষ্য করুন। এর দীর্ঘদিন বাদে কয়েক বছর আগে জ্যোতিবাবু (তৎকালীন সি পি এম পরিচালত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী) হঠাৎ ভোটের দিকে তাকিয়ে ময়দানের এক জনসভায় বলে ফেললেন, "সুভাষ বোস সম্পর্কে অতীতে আমরা ভুল করেছি।" এতদিন বাদে যেন ভোটের স্বার্থেই তাঁদের চৈতন্য উদয় হল।

এটা নিছক ভুল নয়, তাঁরা অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন এবং একবার নয়, বহুবার করেছেন। এমনকি '৪২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের আগুন জ্বলে উঠেছিল (যাকে গান্ধীবাদীরা নিভিয়ে দিয়েছিল) সেদিন সি পি আই সেই আগস্ট অভ্যুত্থানকে 'ফ্যাসিস্টদের চক্রান্ত' বলে বিরুদ্ধতা করেছিল এবং সেই সময়ে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সাহায্য করে দেশপ্রেমের(?) অপূর্ব নিদর্শন রেখেছিল। এদেশে অনেকের ভুল ধারণা ছিল যে, সোভিয়েতের নির্দেশেই

৫৪ ঃ People's War, Jan.১০,১৯৪৩;

তারা একাজ করেছিল। কিছুদিন আগে প্রকাশিত এক পুস্তকে সেই যুগের সিপিআই-এর বিশিষ্ট নেতা প্রয়াত ডঃ রণেন সেনের বক্তব্য থেকে জানা যায়, ১৯৫১ সালে সিপিআই নেতারা মস্কোতে স্ট্যালিনের সাথে সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের উত্তরে '৪২ সালে তাদের এই ভূমিকা উল্লেখ করলে স্ট্যালিন খুব বিরক্ত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য তাঁদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। ডঃ রণেন সেন লিখছেন, "আমাদের নেতারা বলেন যে, ফ্যাসিস্টবিরোধী শক্তিকে আরো শক্তিশালী করার জন্যই আমরা ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিইনি।" এর উত্তরে স্ট্যালিন ভর্ৎসনার সুরে বলেন, "আপনারা জানেন বোধহয়, ব্রিটেন ও আমেরিকা আমাদের প্রায় কিছুই সাহায্য করেনি। আমাদের নিজেদের শক্তির জোরে আমরা জিতেছি। প্রথমে তারা দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতেও রাজি হয়নি। যখন লালফৌজ হিটলার বাহিনীর পিছনে তাড়া করে অগ্রসর হতে লাগল, তখন তারা, পাছে লালফৌজ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে, সেই ভয়ে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলে।" এরপর বিরক্ত স্ট্যালিন অভিযোগ করে বললেন, "আপনারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা পরিত্যাগ করে ব্রিটিশের সঙ্গে একপ্রকার সহযোগিতা করেছেন।"[৫৫] প্রশ্ন করলে আজ এই ব্যাপারেও সি পি এম - সি পি আই নেতারা হয়তো ভুল স্বীকার করবেন, কিন্তু ভুল স্বীকার করার কোন মানেই হয়না যদি সেটা আন্তরিক না হয় এবং তার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করে তার থেকে সঠিক শিক্ষা না নেওয়া হয়। এ সম্পর্কে মহান লেনিন একটা মূল্যবান শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন যে, "নিজের ভুলগুলি সম্পর্কে মানসিকতা কী, এটাই হচ্ছে অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা সঠিক পদ্ধতি যার দ্বারা বিচার করা যায়, সেই দল কতটা আন্তরিক এবং কিভাবে এই দল নিজ শ্রেণি এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতি কর্মে তার দায়িত্ব পালন করে। একটা পার্টি সত্যিই সিরিয়াস কিনা, সে তার কর্তব্য পালন করছে কিনা, সেই দল নিজ শ্রেণি এবং জনগণকে শিক্ষিত করছে কিনা ও ট্রেনিং দিচ্ছে কিনা, তারও বিচারের মাপকাঠি হচ্ছে, সে দলটি খোলাখুলি তার ভুল স্বীকার করছে কিনা, এই ভুলের কারণ নির্ধারণ করছে কিনা, কী কী অবস্থায় এই ভুল হয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখছে কিনা এবং সংশোধনের পথ বের করে সংগ্রাম করছে কিনা।"[৫৬] বলাবাহুল্য সি পি এম - সি পি আই নেতারা লেনিন নির্ধারিত এই পথ কখনও অনুসরণ করেননি, করলে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে তাঁদের দল কোনদিনই যথার্থ মার্কসবাদী দল ছিল না। আর এইজন্যই সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এবং আজও ক্রমাগত অমার্কসীয় কার্যকলাপ করে বিপ্লবী আন্দোলনের চরম ক্ষতি করে চলেছেন এবং মহান মার্কসবাদ-কমিউনিজমের গৌরবময় মর্যাদাকে এদেশে ভূলুণ্ঠিত করেছেন।

তাঁরা নিজেরা কতটা কি ভুল বুঝেছেন জানি না, কিন্তু তাঁদের এই ভুলের মাশুল দীর্ঘ দিন ধরে এ দেশের মানুষকে দিয়ে যেতে হচ্ছে, আরও বহুদিন দিতে হবে। সেদিন

৫৫ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত- ডঃ রণেন সেন ৫৬ ঃ লেফট উইং কমউনিজম এ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিসঅর্ডার

যদি তাঁরা বলিষ্ঠভাবে নেতাজির পাশে দাঁড়াতেন, নেতাজিকে অপসারিত করার বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রকে রুখতেন, তা হলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরকম হত। সবটা না পারলেও অনেকটা এগিয়ে যেতে পারতাম। কংগ্রেসের নেতৃত্বে তিনি থাকতে পারলে, কংগ্রেসকে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামী লাইন গ্রহণ করাতে পারলে নেতাজি নিশ্চয়ই বিদেশে যাওয়ার কথা ভাবতেন না। এ দেশের বুকেই বিপ্লবী অভ্যুত্থান গড়ে তুলতেন, যা পারলেন না বলেই বিদেশে গেলেন। এদেশে থাকতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই ১৯৪২ সালের ঐতিহাসিক আগস্ট অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়ে সফল করতে পারতেন। দেশের পরিস্থিতিও ভিন্নতর হত। ওরা অভিযোগ তোলে—নেতাজি ফ্যাসিস্টদের সাথে হাত মিলিয়েছেন, নেতাজি ফ্যাসিস্টদের দালাল। এ কথা গান্ধীবাদীরাও বলেছিলেন, জ্যোতিবাবুরাও বলেছিলেন। অথচ নেতাজিকে এতটুকু বুঝলে, চিনলে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নেতাজির উপর কলঙ্ক আরোপ করতে না চাইলে এ অভিযোগ করাই চলে না, তাঁর মতো দেশপ্রেমিক সম্পর্কে কখনওই এটা ভাবা চলে না। বরঞ্চ সেদিনকার জার্মানি-ইতালির ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন, তা জানতে পারলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যাওয়ার কথা। জার্মানির নাৎসিবাদ ও হিটলারের তীব্র সমালোচনা করে ১৯৩৬ সালে মিউনিখের জার্মান একাডেমির ডিরেক্টর ডঃ থিএরফেলডারকে লিখেছিলেন, "আজ আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, জার্মানির নূতন জাতীয়তাবাদ যে শুধু সঙ্কীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকই নয়, উদ্ধতও—এই ধারণা নিয়েই দেশে ফিরে যাচ্ছি। হিটলারের মিউনিখে দেওয়া সাম্প্রতিক বক্তৃতায় নাৎসি দর্শনের সারমর্ম আছে। ...দুর্বল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই নূতন জাতিবৈষম্যবাদী দর্শন সাধারণভাবে সাদা জাতিগুলোর ও বিশেষভাবে জার্মান জাতির মহিমা কীর্তন করেছে। ...'মাইন ক্যাম্প'-এ হিটলার জার্মানির পুরানো ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনা করেছে, কিন্তু নাৎসি জার্মানি তার পুরানো উপনিবেশগুলি সম্পর্কে দাবি তুলতে শুরু করেছে।"[৫৭] শুধু তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুকূল পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও লেনিনের মতো সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সে সুযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং ফ্যাসিস্ট মুসোলিনী সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখল করায় নেতাজি ১৯৪০ সালে রামগড়ের ভাষণে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "১৯২২ সালে ইতালি সমাজতন্ত্রের জন্য সমস্ত দিক থেকে ও সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়েছিল, তার প্রয়োজন ছিল একজন লেনিনের। তখন তেমন একটি মানুষ না থাকায় সেই সুযোগ সমাজতন্ত্রীদের হাতছাড়া হয়ে গেল। ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনী তৎক্ষণাৎ এটা কাজে লাগাল। তার রোম অভিযান ও ক্ষমতা দখলের দ্বারা ইতালির ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন মোড় নিল এবং ইতালিতে শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে এল ফ্যাসিবাদ।"[৫৮] হরিপুরা ও ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর ভাষণেও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কি গভীর আস্থা প্রকাশ পেয়েছে, সেটা আগেই উল্লেখ করেছি।

৫৭ ঃ ১৯৩৬ সালে জার্মান একাডেমির ডিরেক্টরকে লেখা ; ৫৮ ঃ ক্রশরোডস্

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে জার্মানি ও ইতালির ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নেতাজি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এত কথা বলেছিলেন, দেশত্যাগ করার পর সেই তাদেরই সাহায্য তিনি চাইতে গেলেন কেন? ইতিহাস বলে — নেতাজি ভারতবর্ষের বাইরে কাবুলে গিয়ে সাহায্যের জন্য প্রথম যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন জার্মানি ও জাপানের সাথে নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে প্রথমেই তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু তখনকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এই সাহায্য দেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ তখন জার্মানি-ইতালির ফ্যাসিবাদ ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধান শত্রু হিসাবে দেখা দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এদের দ্বারা আক্রান্ত হতে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের তখন প্রয়োজন ছিল জার্মানি-ইটালি-জাপানের বিরুদ্ধে ইংরেজ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ব্যবহার করা, তার জন্য এদের সাথে কৌশলগত মৈত্রী গড়ে তোলা, যেটা অনেক চেষ্টা করে গড়ে তুলতে হয়েছে। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ব্রিটিশ-ফরাসী-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ষড়যন্ত্র করেছিল জার্মান-ইতালি-জাপানকে দিয়ে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ধ্বংস করার। জার্মানিকে এজন্য নানাভাবে সাহায্যও করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে ওদের সাথেই প্রথমে যুদ্ধ বেধে গেল। এই অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে নেতাজিকে সাহায্য দেওয়া সম্ভব ছিল না। এই অক্ষমতাই তাঁরা নেতাজিকে জানিয়েছিলেন। বোঝা যায় সোভিয়েতের এই অসুবিধার কথা নেতাজিও বুঝতে পেরেছিলেন। সেইজন্য তিনি এই প্রশ্নে সোভিয়েত সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি বা সোভিয়েত-বিরোধী কোন বিদ্বেষও পোষণ করেননি। যদিও সুভাষবাদী বলে পরিচিত একদল মানুষ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে এ নিয়ে অনেক কুৎসা রটনা করেছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে বাধ্য হয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র তখন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবেন ভেবে জার্মানি-জাপানের সাথে ইংরেজের দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করতে চাইলেন। কারণ তাঁর কাছে তখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ প্রধান শত্রু ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য। নেতাজি যে গভীর দেশাত্মবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপানকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, যেমন বার্মার জাতীয়তাবাদী নেতা আয়ুং সাঙ ও ইন্দোনেশিয়ার ডঃ সোয়েকার্নোও করেছিলেন, পরে এঁরা যেমন আবার জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, প্রয়োজনে নেতাজিও যে জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন — এই বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ থাকতে পারে কি? এটা ট্যাকটিক্স হিসাবে ভুল ছিল কি ঠিক ছিল, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু তাঁকে 'জাপানের দালাল' বলে চিহ্নিত করা যায় কি? তিনি যে সারা জীবন লড়াই করে গেলেন, সে কি ভারতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য? এই তথাকথিত কমিউনিস্টরা সেদিন এই নেতাজিকেই 'জাপান সাম্রাজ্যবাদের দালাল', 'বিশ্বাসঘাতক', 'দেশদ্রোহী' বলে অভিহিত করেছিলেন! এসব এখনকার ছাত্র-যুবকরা না জানতে পারে, কিন্তু প্রবীণরা কি ভুলতে পারেন? আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি, জাপানি সাম্রাজ্যবাদ এ দেশ দখল

করতে চাইলে, সুভাষচন্দ্রই হতেন প্রথম মানুষ যিনি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, প্রয়োজনে শহিদ হতেন। এই প্রসঙ্গে নেতাজির প্রতিষ্ঠিত আই এন এ-র একজন অধিনায়ক শাহনওয়াজ খানের একটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের নিজস্ব শক্তিই আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ এবং ভারতবর্ষে ঢোকার পর যদি আমরা দেখতাম যে, জাপানিরা ব্রিটিশের জায়গাটাই নিতে চাইছে, আমরা তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধেও লড়তাম।' জার্মান ও জাপানিদের সম্পর্কে নেতাজির দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর সহকর্মীর এই উক্তিতে পাওয়া যায়। জার্মান-জাপানি নেতৃত্বের সাথে তাঁর নানা প্রশ্নে যে মতপার্থক্য ঘটেছে এবং যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে তিনি যে বলেছিলেন—"সমস্ত পরাধীন দেশের জনগণকে মুক্তি অর্জনের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপর নির্ভর করতে হবে" — এ তো আজ আমরা সকলেই জানি। তা ছাড়া আর একটি বিষয়ও বিশেষভাবে আপনাদের বুঝতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি-ইতালির ফ্যাসিবাদ ও জাপানি সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইংরেজ-ফরাসি-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে অ্যালায়েন্স করে লড়েছে, আর নেতাজি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জার্মানি-জাপানের সাহায্য নিয়ে লড়েছেন। এই অর্থে যুদ্ধে নেতাজির শত্রু সোভিয়েতের সহযোগী, অন্য দিকে নেতাজির সহযোগীরা সোভিয়েতের শত্রু। এ অবস্থাতেও, জার্মানি-জাপান বারবার চাওয়া সত্ত্বেও, চাপ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করায় বারবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মানি যখন সমস্ত আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙঘন করে অনাক্রমণ চুক্তি সত্ত্বেও এমনকি যুদ্ধ ঘোষণাও না করে রাশিয়াকে আচমকা আক্রমণ করেছিল, নেতাজি তখন ইতালিতে ছিলেন এবং রোমের জার্মান বিদেশ দপ্তরের এক কূটনৈতিক অফিসার বুয়ারমান-এর কাছে তীব্র ভাষায় এই আক্রমণের নিন্দা করেন। যে ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্টে সেই অফিসার লিখেছিলেন — "সুভাষ বোসের কথা শুনে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে রুশ-জার্মান যুদ্ধের উৎপত্তির প্রশ্নে তিনি সোভিয়েত বক্তব্যের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছেন।"[৫৯]

যুদ্ধ চলাকালীন রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি কথাও তিনি বলেননি, বললে হিটলার-তোজো নিশ্চয়ই খুশি হত, কিন্তু তিনি সে পথে যাননি। এই ঘটনাই প্রমাণ করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাঁর আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কত গভীরে ছিল। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যায় আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি বিখ্যাত উক্তি। তিনি বলেছিলেন, "আজকের যুগে যারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক, তারা কমিউনিজম ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অকৃত্রিম বন্ধু ও নির্ভরশীল শক্তি বলে গণ্যও করবে।"[৬০] নেতাজির ভূমিকাও তাই।

---

৫৯ ঃ Netaji Through German Lens - Nanda Lal Mukherjee ;

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নেতাজির সংগ্রাম

আজ সমগ্র দেশের পরিবেশ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বিপর্যস্ত হচ্ছে। 'হিন্দুত্ব'র জিগির তুলে বার বার দাঙ্গার আগুন জ্বালানো হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ খুন হচ্ছে, ঘরবাড়ি-সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে, নারী ধর্ষণ হচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চেষ্টা করেও সে সময়ে এত দাঙ্গা বাধাতে পারে নি। যা বিজেপি ও কংগ্রেস শাসনে ঘটেছে। এসব আক্রমণ চলছে যাতে জনগণের ঐক্য ভেঙে গণআন্দোলন ধ্বংস করা যায় এবং ভোটে ফয়দা তোলা যায়। সেই সময়েই নেতাজি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও কী প্রবল সংগ্রাম করেছিলেন। সেই সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই। তিনি সাম্প্রদায়িক শক্তি সম্পর্কে সেই সময়ে গভীর উদ্বেগে সতর্ক করে বলেছিলেন, "হিন্দু মহাসভা (যার থেকে বর্তমান বিজেপি এসেছে)... অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িকতা পোষকতা করতে শুরু করেছে, বাংলাদেশের এবং অন্যত্র হিন্দুদের মন বিষিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন সাম্প্রদায়িক বিষ উদগার করে চলেছে। ...হিন্দু মহাসভা ও মুসলীম লীগের মত সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি আগের থেকে অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে।"[৬১] ঐ একই বছর মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম শহরে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, "প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা হিন্দু মহাসভার নামে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়া উহাকে কলুষিত করিয়াছেন...। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগকে ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠাইয়াছে। ত্রিশূল ও গৈরিক বসন দেখিলে হিন্দু মাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়া ধর্মকে কলুষিত করিয়া হিন্দুমহাসভা রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। হিন্দুমাত্রেরই এর নিন্দা করা কর্তব্য। ...এই বিশ্বাসঘাতকদের আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন। তাদের কথা কেউ শুনবেন না"[৬২]

আজকে বিজেপি-আর এস এস যেভাবে হিন্দু ধর্মকে অপব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করছে, এটা দেখলে নেতাজি কী বলতেন? সেদিনই তিনি এই সাম্প্রদায়িক শক্তি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, "এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী লোক ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থলোভে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে—স্বাধীনতা সংগ্রামে এ শ্রেণির লোককে শত্রুর মধ্যে গণ্য করা প্রয়োজন।"[৬৩] সেই যুগেই যারা 'হিন্দু ভারতের' শ্লোগান তুলেছিল, তাদেরও একই ভাবে সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন,"...হিন্দুরা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া 'হিন্দু রাজের ধ্বনি' শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা।"[৬৪] তিনি একথাও বলেছেন,"হিন্দু ও মুসলমান স্বার্থ পৃথক —ইহার চেয়ে মিথ্যা বাক্য আর কিছু হইতে পারে না। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ইত্যাদি বিপর্যয় তো কাহাকেও রেহাই দেয় না।"[৬৫] কিভাবে এই সাম্প্রদায়িকতা দূর করা যায় সেই সম্পর্কে তিনি গাইডেন্স

---

৬০ ঃ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গণআন্দোলনের প্রধান বিপদ, রচনাবলী-৪র্থ খণ্ড; ৬১ ঃ ৪ঠা মে ১৯৪০ সালে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়; ৬২ ঃ ১৪ মে, ১৯৪০, আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত। ৬৩ ঃ ৭/৭/১৯২৯, যশোহর জেলা সম্মলন ; ৬৪ ঃ ১৪ জুন ১৯৩৮ সালে, কুমিল্লার ভাষণ ; ৬৫ ঃ ১৩/৪/১৯২৮, রাজশাহী শহরে জনসভায় ভাষণ

দিয়ে বলেছেন,"আমাদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ মীমাংসায় গভীরতর প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তার উপর আমি জোর দিতেছি।...অন্যান্য সকল ধর্মের ন্যায় ইসলামের স্থানও ভারতে রহিয়াছে। প্রত্যেক ধর্মীয় গোষ্ঠীরই ঐতিহ্য, আদর্শ ও ইতিহাসের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ ইহা পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও ঐক্যের পথ সহজ করিয়া তুলিবে।...এই সাংস্কৃতিক সহযোগ স্থাপন করিতে হইলে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞানভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ধর্মান্ধতার গোঁড়ামি সাংস্কৃতিক সহযোগের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যতীত কোন উৎকৃষ্টতর প্রতিকার নাই।"[৬৬]

এই সমস্যা সমাধানে তিনি পৃথক পথ নির্ধারণ করে আরও বলেছেন, "...দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার ক্যান্সার নির্মূল করা ...বর্তমান অবস্থায় প্রায় অসম্ভব মনে হতে পারে। কিন্তু এই কাজই অনেক সহজ হয়ে যাবে যদি একটিবার আমরা সমগ্র জাতিকে জড়িয়ে বিপ্লবী মানসিকতার বিকাশ ঘটাইতে পারি। ...স্বাধীনতার সংগ্রামে জনগণ যখন একে অপরের সংগ্রামের সাথী (কমরেড ইন আর্মস) হয়ে উঠবে তখন সকলের জীবন একই লক্ষ্যে নূতন প্রেরণায় জাগ্রত হবে এবং এরই সঙ্গে গড়ে উঠবে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, উন্মোচিত হবে এক নূতন দিগন্ত, উন্মেষ ঘটবে এক নূতন দৃষ্টির। এই বিপ্লব যেদিন আসবে, সেদিন ভারতীয় জনগণ এক পরিবর্তিত জনগণে পরিণত হবে।"[৬৭] বলা বাহুল্য এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র যদি কংগ্রেস নেতৃত্বে থাকতে পারতেন, আপসমুখী গান্ধীবাদীদের পরাস্ত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের পথ অনুসরণ করতে পারতেন, তাহলে অন্যান্য সমস্যার সমাধান ছাড়াও 'সাম্প্রদায়িকতার ক্যান্সার নির্মূল' করতে পারতেন এবং ভারতবর্ষকে বিভক্ত করা যেত না। যিনি ব্রিটিশ ভারতে ও পরবর্তীকালে পাকিস্তানে সর্বাধিক সময় কারারুদ্ধ ছিলেন এবং সীমান্ত গান্ধী বলে সেই যুগে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন সেই সর্দার গফফর খান ভারতবর্ষ সফরের সময় নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে যথার্থই বলেছিলেন, "his heartiest congratulation only would go to the only leader Netaji Subhas for his sincere act of love towards the poor. Only Subhas could wipe out the communal feeling plunged India and Pakistan."[৬৮] এদেশের অনেকেরই এই ভুল ধারণা আছে যে মুসলমানরাই দেশ ভাগের জন্য দায়ী। হিন্দু সদস্যরা গান্ধীজির উপস্থিতিতে একযোগে যখন এই দেশ ভাগে সম্মতি জানায়, তখন বলিষ্ঠভাবে দেশভাগের বিরোধিতা করেছিলেন দুইজন মুসলিম সদস্য, একজন এই সর্দার গফফর খান, আরেক জন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

এইসব ঘটনা আজকের দিনে অনেকেরই অজানা। নানাভাবে ইতিহাসকেও বিকৃত করা হচ্ছে। আজ দেশে বিজেপি, আর এস এস যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে, নেতাজি থাকলে কি এসব চলতে দিতেন? নিশ্চয়ই সর্বশক্তি দিয়ে রুখে

৬৬, ৬৭ ঃ ৩রা মে, ১৯২৮, মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনের ভাষণ, ৬৮ ঃ Times of India, 6.4.1990 ;

দাঁড়াতেন। নেতাজির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন জানাতে হলে এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করতে হবে।

একথাও অনেকের অজানা যে বিজেপি-আর এস এস কথায় কথায় বিরোধী কণ্ঠ রোধ করার জন্য 'জাতীয় স্বার্থ বিরোধী', 'ভারতের স্বাধীনতা বিরোধী' তকমা লাগিয়ে দিচ্ছে, তারা কিন্তু ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতাই করেছে। যে আর এস এস, বিজেপি দলের নিয়ন্ত্রক সেই আর এস এস-এর গুরু গোলওয়ালকার স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বলেছেন,"আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের যে ধারণা ভূখন্ডভিত্তিক জাতীয়তার তত্ত্ব ও সাধারণ শত্রু (ব্রিটিশ)কে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, সেটা আমাদের যথার্থ প্রেরণাদায়ক হিন্দু জাতীয়তাবাদের সদর্থক ধারণা থেকে বঞ্চিত করেছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত করেছে। ব্রিটিশ বিরোধিতাকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের সমার্থক করা হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা আমাদের সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতাদের ও জনগণের উপর সর্বনাশা প্রভাব ফেলেছে।..."[৬৯] অর্থাৎ আর এস এস প্রধানের বক্তব্য অনুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শত্রু গণ্য করে পূর্বতন অখন্ড ভারতের সকল জনগণকে যুক্ত করে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে, 'স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে' পর্যবসিত করা হয়েছে এবং 'ব্রিটিশ বিরোধিতাকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবদের সমার্থক করা হয়েছে—এইসব হচ্ছে 'প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা', কারণ এটা 'যথার্থ প্রেরণাদায়ক হিন্দু জাতীয়তাবাদের সদর্থক ধারণা থেকে বঞ্চিত করেছে।' অর্থাৎ আর এস এস-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী 'অখন্ড ভারতের সমগ্র জনগণের ঐক্যবদ্ধ' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, কারণ এটা 'হিন্দু জাতীয়তাভিত্তিক ছিল না। গোলওয়ালকরজি শুধু এতেই ক্ষান্ত হননি। তিনি আরও বলেছেন,"...তারাই একমাত্র জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক, যারা তাদের অন্তরে হিন্দু জাতির গৌরব পোষণ করে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে কাজ করে। বাকি যারা দেশপ্রেম জাহির করে হিন্দু জাতির স্বার্থহানি করছে তারা বিশ্বাসঘাতক।"[৭০] আর এস এস প্রধানের এই বক্তব্য অনুযায়ী নেতাজি সহ সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এবং বীর শহিদেরা সকলেই 'বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু'।

এই আর এস এস শুধু এসব মন্তব্যই করেনি, সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে, ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেছে, যার জন্য বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র সচিব ভি. আয়েঙ্গার ওদের সার্টিফিকেট দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে ১৯৪৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি লিখেছিলেন,"সংঘ নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে সরকারি আইনের চৌহদ্দির মধ্যে রেখেছে ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯৪২ সালে যে গোলমাল শুরু হয়েছিল, সংঘ তাতে কোনরকম অংশগ্রহণ করেনি।" এছাড়াও একদিকে নেতাজি ও অন্যদিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কোন রকম সাহায্য করবে না,

৬৯, ৭০ ঃ We or our nationhood defined - গোলওয়ালকার ;

সেখানে হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকার সর্বাত্মক সাহায্য দেওয়ার জন্য হিন্দুদের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে, "So far as India's defense is concerned, Hindudom must ally unhesitantly, in a spirit of responsive co-operation with the war effort of the Indian Government (British Government) in so far as it is consistent with the Hindu interests by joining the Army, Navy and the Aerial forces in as large a number as possible and by securing an entry in all ordnance, ammunations and war craft factories....Hindu Mahasavaits must, therefore, rouse Hindus especially in the provinces Bengal and Assam as effectively as possible to enter the military forces of all arms without losing a single minute."[৭১] এখানে স্মরণ করা দরকার এই সাভারকারই আন্দামান জেল থেকে ছাড়া পাবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে ১৪ নভেম্বর, ১৯১৩ সালে 'ক্ষমা ভিক্ষায়' লিখেছিলেন, "Therefore if the Government in their manifold beneficience and mercy release me, I for one can not but staunchest advocate of constitutional progress and loyalty to the English Government which is the foremost condition of that progress. ...Moreover conversion to the constitutional line would bring back all those misled young men in India and abroad who were once looking up to me as their guide. I am ready to serve the Government in any capacity they like, for as my conversion is conscientious so I hope my future conduct would be. By keeping me in jail nothing can be got in comparision to what would be otherwise. The mighty alone can afford to be merciful and therefore where else can the prodigal son return but to the parental doors of the Government."[৭২] বলা বাহুল্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের parental doors, prodigal son এর প্রতি mercy প্রদর্শন করে এবং সে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বাত্মক সাহায্য দেয়, যার অন্যতম হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই ভূমিকা। এই সাভারকারকে বিজেপি সরকার জাঁকজমক করে মহান দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা বলে হাজির করছে। এর চেয়ে বড় মিথ্যাচার আর কী হতে পারে!

এবার আপনারাই বলুন, এই বিজেপি ও আর এস এস নেতৃবৃন্দ তাদের পূর্বেকার কলঙ্কময় ইতিহাসকে বিলুপ্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত কারার জন্য ও ভোটে ফয়দা তোলার জন্য ২৩শে জানুয়ারি নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করছে, নানা স্তুতি জ্ঞাপন করছে, সেটা কি চূড়ান্ত ভন্ডামি ও প্রতারণা নয়? অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেস ও সি পি এম, সি পি আই নেতৃবৃন্দের ২৩শে জানুয়ারি উদযাপনের কি কোন নৈতিক অধিকার আছে? তাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও কি মিথ্যাচার

৭১ ঃ Samagra Savarkar Wangmasya : Hindu Rashtra Darshan, Vol-IV ; ৭২ঃ From Penal Settlements in Andamans by R. C. Mazumdar, published by department of culture, Govt. of India in 1974.

নয়? আজ বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর এস এস-এর কাজকর্ম দেখলে তিনি কি বলতেন এবং করতেন? নিশ্চয়ই সর্বশক্তি দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেন।

নারী মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে নেতাজি

নারী, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুবকদের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে নেতাজি যেসব মূল্যবান বক্তব্য রেখে গেছেন, সেগুলি আজও স্মরণীয়। নারীমুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "নারীকে সর্বতোভাবে মুক্ত করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে, অর্থের বৈষম্য দূর করিতে হইবে এবং বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকে (কি পুরুষ কি নারী) যাহাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"[৭৩] নারীদের তিনি বলেছেন, "পুরুষ যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ভোগ করছে নারীকেও আমরা সেই স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী দেখতে চাই। পুরুষেরা কোনওদিন তা নারীকে দেবে এবং দিলেও নারীরা তা সত্যি পাবে, এ বিশ্বাস আমাদের নেই। নারীকেই বিদ্রোহ করে স্বাধিকার অর্জন করতে হবে, তাছাড়া আর কোন পথ নেই।"[৭৪] তাঁর এই বক্তব্য পুঁজিবাদী শোষণে-নিপীড়নে অত্যাচরিত নারীদের ক্ষেত্রে আজও প্রাসঙ্গিক। নারীদের সাহস, তেজ ও ত্যাগের ক্ষমতার উপর তাঁর কত আস্থা ছিল বোঝা যায়, যখন দেখা যায় আই. এন. এ বাহিনীতে তিনি নারীদের নিয়েও আলাদা রেজিমেন্ট গঠন করেছিলেন।

শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে নেতাজি

শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গেও তিনি বলেছিলেন, "শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রের সব শক্তি মালিকের সমর্থনে নিয়োজিত হয়, আর স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের কাজে মালিকশ্রেণী সরকারকে সাহায্য করে। অদূর ভবিষ্যতে দেশের শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনেও শ্রমিকশ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ অংশ লইবে।"[৭৫] সেদিন ব্রিটিশ শাসনে যা প্রত্যক্ষ করে তিনি একথা বলেছিলেন, আজ পুঁজিবাদী শাসনে তা বহু গুণ বেড়ে গেছে। ফলে শ্রমিকশ্রেণিকে যথার্থ বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে হবে। আবার মালিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শ্রমিকদের সেই যুগেই সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন যে, "বিশ্ব-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা আসিয়াছে। তাহার প্রভাব এখানেও পড়িতেছে। প্রায় সব কোম্পানিই, এমন কি টাটা ও বার্মা অয়েল কোম্পানিও লোক ছাঁটাই করিতেছে। এ পরিস্থিতিতে আপনারা আপনাদের ইউনিয়নকে শক্তিশালী করুন। আপনাদের মালিকরা আশ্বাস দিতেছেন যে তাহারা শ্রমিক অফিস খুলিবেন ও আপনাদের স্বার্থ দেখিবেন, অতএব আপনারা ইউনিয়নগুলি ভাঙিয়া দিন। এ আশ্বাসে ভুলিবেন না।"[৭৬] অনেকেই হয়ত জানেন না

৭৩ঃ সুভাষচন্দ্র রচনাবলি ;৭৪ ঃ তরুণের স্বপ্ন ৭৫, ৭৬ ঃ ১৯২৮ সালে খড়্গপুরে রেলওয়ে শ্রমিক সভায় ভাষণ ;

যে, নেতাজি সেই সময় এই দেশে বহু শ্রমিক ধর্মঘটে ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং এ আই টি ইউ সি (তখনকার একমাত্র ঐক্যবদ্ধ সংগঠন)-এর নেতৃত্বে বহুদিন ছিলেন। গরিব কৃষকদেরও সজাগ করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "কৃষকরা সংঘবদ্ধ হউন, তাহা না হইলে আপনাদের অধিকারের দাবি স্বীকৃতি পাইবে না। ইহা ভাগ্যের পরিহাস যে যাহারা আমাদের খাদ্য উৎপাদন করেন, তাহাদিগকে খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর শিকার হইতে হয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য কৃষকদের উচিত নিজেদের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট গড়িয়া তোলা।"[৭৭]

বিশ্বপ্রকৃতির সত্যানুসন্ধানে নেতাজি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন

নেতাজি গভীর সত্যানুসন্ধানী ছিলেন। চলার পথে যেভাবে নতুন সত্য গ্রহণের জন্য সব সময়ই প্রস্তুত থাকতেন, সেটা সকলের কাছে দৃষ্টান্তমূলক। তিনি জীবনের প্রথমদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে 'যৌনতাজনিত আকর্ষণকে জয়' (sex-conquest) করার উপর কিছুদিন অত্যধিক গুরুত্ব ও সময় ব্যয় করেছিলেন, সেটা যে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত ছিল, পরবর্তীকালে নিজের আত্মজীবনী 'An Indian Pilgrim' পুস্তকে নিজেই তা ব্যক্ত করেছেন। দার্শনিক চিন্তায় তিনি প্রথম দিকে বেদান্ত ও বিবেকানন্দের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, পরে হেগেলীয় ডায়ালেকটিকসের প্রতি আকৃষ্ট হন ; আরও পরে বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতিকেই গ্রহণ করে বস্তুবাদ সম্পর্কে পুরনো ভাববাদী ধারণা থেকে মুক্ত হচ্ছিলেন। ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করার প্রাক্কালে বিভিন্ন দর্শন সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করে তিনি পরবর্তী প্রজন্মের তরুণদের উদ্দেশ্যে 'আমার জীবনের বাণী'তে যা লিখেছেন, সেটা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "আমি যখন থাকব না, আমার ইচ্ছা এটি তাদের পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে, যারা জীবনের গভীরতর সমস্যা সম্পর্কে উৎসুক ...পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপের প্রশ্নে, অদ্যাবধি বিজ্ঞানের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি, তা জেনে আমাদের খোলা মনে থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও সত্য প্রকট হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে আমাদের মনে রাখা উচিত বস্তুবাদ সম্পর্কে আগেকার ধারণা সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেছে। একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অন্যদিকে দার্শনিক যুক্তি ও অনুমান, এই দুয়ের আক্রমণে তা পর্যুদস্ত।"[৭৮] নেতাজি আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করার দিন যুবকদের উদ্দেশ্যে এই 'পার্সোনাল টেস্টামেন্ট' কেন লিখলেন এবং কেন তাতে বিজ্ঞানের আবিষ্কার, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বস্তুবাদ সম্পর্কে নতুনভাবে বিবেচনার কথা যুবকদের বললেন? এর তাৎপর্য অপরিসীম। প্রথম জীবনে এবং তারপরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নেতাজি মূলত ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী ছিলেন। কিন্তু তিনি গোঁড়া ছিলেন না। খোলা মনে সত্যানুসন্ধানী ছিলেন। বোঝা যায়,

৭৭ ঃ ১৯৩৭ সালে কিষানসভার উদ্যোগে জনসভায় ভাষণ ৭৮ ঃ ক্রসরোডস্

পরবর্তীকালে তিনি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যানুসন্ধানের পথে এগোচ্ছিলেন এবং এটা বুঝতে পারছিলেন বস্তুবাদ সম্পর্কে তাঁর পূর্বতন বিরূপতা সঠিক ছিল না। অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ভাববাদের পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে বস্তুবাদের দিকে দ্রুত এগোচ্ছিলেন, তাই সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে একমাত্র বিজ্ঞানকেই তিনি গ্রহণ করতে বলেছেন। প্রথম জীবনে ভাববাদকে অভ্রান্ত গণ্য করে তিনি যে ভুল করেছিলেন, সেই ভুল যাতে পরবর্তী প্রজন্ম না করে সেজন্যই তিনি যুবকদের উদ্দেশে এই মূল্যবান উপদেশ ব্যক্ত করেছিলেন, কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন আমরণ অনশন ধর্মঘটে তাঁর মৃত্যুও ঘটতে পারে। কত বড় সত্যনিষ্ঠ হলে এটা সম্ভব! তাই সত্যানুসন্ধানী এই মহান দেশপ্রেমিক বিপ্লবী যোদ্ধা দেশের যুবকদের এই বিষয়ে সতর্ক করে গেছেন। এটা সকলের কাছে এক অমূল্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। যদিও এই আমরণ অনশন চলাকালীন দেশে উত্তাল বিক্ষোভের ফলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর স্বগৃহে অন্তরীণ রাখতে বাধ্য হয়। সেখান থেকে তিনি কীভাবে গোপনে বিদেশে পাড়ি দিলেন সে এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস। পরের কয়েক বছর তিনি বিদেশে থেকে দেশের মুক্তি সংগ্রামের আয়োজনে দিবারাত্র লিপ্ত হয়ে গেলেন। যার ফলে দর্শন চর্চায় আর এগোবার তিনি সুযোগ পাননি। কিন্তু এভাবে বিজ্ঞানকে একমাত্র হাতিয়ার করে যদি দর্শন চর্চায় তিনি আরও এগোতে পারতেন, তাহলে হয়ত মার্কসবাদকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে ভারতবর্ষে বিশিষ্ট মার্কসবাদীর ভূমিকা নিতে পারতেন এবং মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের পরিমণ্ডল অতিক্রম করে সর্বহারা বিপ্লবের মহান পতাকা বহন করতে পারতেন।

এখানে আরেকটি বিষয়ও আপনাদের কাছে গভীর ব্যথার সাথে বলতে চাই। নেতাজি ভারতবর্ষে থেকে জনগণকে সংঘবদ্ধ করতে পারলেন না কেন? যদিও এর জন্য কম চেষ্টা করেননি। এর কারণ খুঁজতে হলে জানতে হবে সেদিনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসিত ভারত শ্রেণি বিভক্ত ছিল, একদিকে শক্তিশালী জাতীয় পুঁজিবাদ অন্য দিকে শ্রমিক শ্রেণি ও গরীব কৃষক, ভূমিদাস ও ক্ষেতমজুর। জাতীয় পুঁজিবাদ গান্ধীবাদী নেতৃত্বকে মদত দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করে আপসের পথে ক্ষমতা দখল করতে চাইছিল এবং সেটা শেষ পর্যন্ত করতে পেরেছে। অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে গরীব কৃষক, ভূমিদাস ও ক্ষেতমজুরদের সংঘবদ্ধ করার জন্য কোন যথার্থ মার্কসবাদী দল এদেশে ছিল না, ঐক্যবদ্ধ সি পি আই যে মার্কসবাদ বিরোধী আচরণ করেছিল সেটা আগেই আপনাদের দেখিয়েছি। নেতাজির বিপ্লববাদের পক্ষে ছিল একমাত্র মধ্যবিত্ত ছাত্র-যুবক-জনগণ, শ্রেণিগতভাবে যা দোদুল্যমান, ফলে এটা স্টেবল শক্তি হিসাবে নেতাজির পক্ষে দাঁড়াতে পারেনি। এ'ছাড়া আরেকটি সংকটও কাজ করেছে। বুর্জোয়া শ্রেণি চেয়েছিল জনগণ রাজনৈতিকভাবে অসচেতন, অন্ধ, অজ্ঞ থেকে গান্ধীবাদী নেতৃত্বকে সমর্থন করুক। যেহেতু শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল ছিল না জনগণকে উপযুক্তভাবে রাজনৈতিক সচেতন ও সংঘবদ্ধ করার জন্য, এর ফলে সাধারণ মানুষও মাথা ঘামায়নি জাতীয় কংগ্রেস কোন পথে চলেছে, এর মধ্যে কোন

মত বিরোধ আছে কি, থাকলে কার সাথে কী পার্থক্য আছে, কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক, বেশিরভাগ মানুষ জানতই না যে গান্ধীবাদীদের সাথে নেতাজির কী এবং কেন গুরুতর মতপার্থক্য চলছে, চক্রান্ত করে নেতাজিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর প্রায় সমগ্র জনগণ ধর্মান্ধ থাকায় গান্ধীজিকে অবতার বা সন্ন্যাসী বলে গণ্য করত। ফলে গান্ধীজি ভুল করতে পারে, অজ্ঞাতসারে বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে কাজ করতে পারে ভাবতেই পারত না। আর মুষ্টিমেয় যারা এই পার্থক্যের কিছু কিছু জানত, তারা ভাবত, 'এসব নেতাদের ব্যাপার, তারাই ঠিক করবে, আমরা রাজনীতির কী বুঝি'। এভাবে সাধারণভাবে অসচেতন ও নিষ্ক্রিয় থেকে গান্ধীবাদী নেতৃত্বকে সমর্থন করে গেছে, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র ও রেডিও একতরফা গান্ধীবাদের পক্ষেই প্রচার করে গেছে। ফলে নেতাজির এতবড় মহৎ সংগ্রাম এদেশে সফল হতে পারেনি। এই বেদনাদায়ক পরিণতি থেকে এদেশের মানুষ আজও সঠিক শিক্ষা নিতে পারেননি, শোষণে অত্যাচারিত মানুষ পরিত্রাণ চায়, মুক্তি চায়। কিন্তু কোন পথে মুক্তি আসবে, কিভাবে শোষণমুক্ত হবে, এসব নিয়ে মাথা দেয় না, বলে 'আমরা ছাপোষা মানুষ, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কী করব'। এর সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়া দলগুলি, ভন্ড কমিউনিস্ট দল বারবার বিভ্রান্ত করছে, ঠকাচ্ছে। বারবার ভোট আসে, বুর্জোয়া শ্রেণি মনোনীত একবার এই দলকে, আবার কখনও অন্য দলকে মানুষ ভোট দেয়। খবরের কাগজ, টিভি, রেডিও যেদিকে হাওয়া তোলে, সেই হাওয়ায় ভেসে যায়, একবার ভেবেও দেখে না এই সংবাদ মাধ্যমগুলি কারা চালাচ্ছে, কার হয়ে হাওয়া সৃষ্টি করছে, এর পেছনে যে বুর্জোয়া শ্রেণি কাজ করছে ধরতে পারে না। একবার ভেবেও দেখে না এই দলগুলি ভোটে যে এত টাকা খরচ করে সেই টাকা কোত্থেকে আসে? গরীব মানুষ অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় যখন মরে, তখন যারা খোঁজ নেয় না, এক পয়সা দিয়েও সাহায্য করে না, তারা ভোট কেনার জন্য এত টাকা কোত্থেকে দেয়? কে তাদের দেয়? তারা কি এমনি এমনি দেয়? দেয় শোষক শ্রেণি, একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, ভাগ ভাগ করে ১নং, ২নং, ৩নং দলকে দেয় যাতে সরকারি গদীতে বসে ওদের শোষণের স্বার্থে কাজ করে। তাই পুঁজিপতিরা বিপুল সম্পদের মালিক হচ্ছে, তাদের সেবক এইসব দলের নেতাদের, মন্ত্রীদের, এম এল এ-এম পি'দের কোটি কোটি টাকা স্বনামে বেনামে ব্যাঙ্কে সঞ্চিত হচ্ছে, আর কোটি কোটি জনগণ রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত, ভিখারিতে পরিণত হচ্ছে। ভোটের সময় নানা দলের নানা নেতা কত মূর্তি ধারণ করে, কত ভেল্কি দেখায়, কত গালভরা প্রতিশ্রুতি দেয়, গরীবের দুঃখে কত চোখের জল ফেলে, ভোটে জেতার পর অন্য মূর্তি ধারণ করে। গভীর হতাশায় মানুষ বলে, 'দেশে কিছু হবে না, সবাই সমান, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।' অথচ কেউ ভেবেও দেখে না যে রামায়ণের কাহিনি অনুযায়ী রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, এমনকি হনুমানও লঙ্কায় গিয়েছিল, কেউ রাবণ হয়নি, কিন্তু সীতার দুর্ভোগ হোত না, লঙ্কাকান্ড বাধত না, যদি সীতা সন্ন্যাসীর ভেকধারী রাবণকে চিনতে পারত, তার ফাঁদে পা না দিত। ফলে রাজনীতির চর্চা না করে, কোন দল ধনীর কোন দল

গরীবের, কোন দল শোষক-পুঁজিপতি শ্রেণির আর কোন দল যথার্থই শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের তা বিচার না করে, জনগণ সংবাদ মাধ্যমের তোলা হাওয়ায় ভেসে পুঁজিপতি শ্রেণির এই দল বা ঐ দলকে সমর্থন করছে। বারবার ঠকছে, তবুও ভাবছে 'একবার এদের দেখেছি, এইবার ওদের দেখি'—এভাবেই বুর্জোয়া রাজনীতির চক্করে বাঁধা পড়ে বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে। তাছাড়া ভোটে সরকার পাল্টায়, পুঁজিবাদী শোষণ কি পাল্টায়, শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র কি পাল্টায়? জনগণকে ভাবতে হবে, শোষক শ্রেণি সৃষ্ট সংবাদ মাধ্যমের হাওয়ায় ভেসে, ভোটের সময় কিছু দয়াভিক্ষা নিয়ে এভাবেই দিন চলবে? না কষ্ট করে হলেও রাজনীতি বুঝতে হবে। ভেবে দেখতে হবে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় রাজনীতি না বুঝে অন্ধের মতো বুর্জোয়া গান্ধীবাদী নেতৃত্বকে সমর্থন করে এবং নেতাজির পক্ষে বলিষ্ঠভাবে না দাঁড়িয়ে যে সর্বনাশ হতে দিয়েছে সেই সময়ের জনগণ, আজও কতদিন একইভাবে রাজনীতি চর্চা থেকে বিমুখ থেকে সমগ্র দেশকে আরও ভয়াবহ পরিণতির দিকে যেতে দেবেন। নেতাজির জন্মজয়ন্তী উদযাপন করতে গিয়ে এটা গভীরভাবে ভেবে দেখবেন।

নেতাজির জীবনে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্রী হিসাবেই এসেছিলেন এমিলি শেঙ্কল

এখানে আরেকটা বিষয় নেতাজি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক মনে করে আলোচনা করতে চাই। নেতাজি সুভাষচন্দ্র জীবনসংগ্রামে কত মুক্তমনা, সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন সেটা বোঝা যায় বিবাহ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনেও। প্রথম জীবনে তিনি বিবেকানন্দের চিন্তা অনুযায়ী স্বদেশসেবায় ব্রহ্মচারী জীবনই শ্রেয় গণ্য করেছিলেন। এই চিন্তা যে তাঁর ভ্রান্ত ছিল পরবর্তীকালে তিনি তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিদেশে থাকাকালীন নেতাজির জীবনে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্রী হিসাবে এমিলি শেঙ্কল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ এবং পরাধীন ভারতীয় জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি গভীর মমত্ব ও সহানুভূতির অধিকারিণী হয়ে এলেন এবং নিজ গুণে নেতাজির শ্রদ্ধা ও স্নেহ অর্জন করেন। নেতাজি জানতেন, স্বদেশে এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠবে, প্রতিপক্ষরা জল ঘোলা করবে, অনুরাগী ধর্মান্ধ ভক্তরা খুবই দুঃখ পাবে। বিদেশিনী ও বিধর্মী বলেও নানা প্রশ্ন উঠবে। তা সত্ত্বেও নেতাজি এই ভালবাসার মর্যাদা দিতে কোন দ্বিধাবোধ করেননি। আবার এমিলি শেঙ্কলকে পাঠানো ভালবাসার চিঠিতে তিনি যা লিখেছেন, তাও সকল দেশপ্রেমিকের কাছে, বিপ্লবীদের কাছে পরম শিক্ষণীয়। তিনি লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষ আমার প্রথম এবং একমাত্র প্রেম। আমি আমার প্রথম প্রেমের কাছে সর্বস্ব নিবেদন করেছি, আর কাউকে দেবার মতো আমার কিছু নেই; সামান্য যা আছে, তোমাকে দিয়েছি — তোমার গভীর প্রেমের প্রতিদান হিসাবে তা হয়তো উপযুক্ত নয়। আমার কাছে এর বেশি তুমি আর প্রত্যাশা করো না।"[৭৯]

৭৯ ঃ কলেজ স্ট্রীট জার্নাল, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, একই সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ;

নেতাজি তাঁকে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Indian Struggle' বইটিতে সহযোগিতা করার জন্য এমিলির প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছিলেন। নেতাজি হয়তো ভেবেছিলেন, উপযুক্ত সময়ে দেশবাসীর কাছে এই সংবাদ উপস্থিত করবেন যাতে কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। কিন্তু সেই সময়ের ঝঞ্ঝাবহুল জীবনে এ সুযোগ আর তিনি পাননি। তাই ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাপানের উদ্দেশ্যে সাবমেরিন যাত্রার পূর্বে তাঁর শ্রদ্ধেয় মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে এক চিঠিতে এই সংবাদ তিনি জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "পরম পূজনীয় মেজদাদা, আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। হয়তো পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয়, তাহলে ইহজীবনে আর কোন সংবাদ দিতে পারিব না। তাই আজ আমি আমার সংবাদ এখানে রাখিয়া যাইতেছি — যথাসময়ে এই সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছিবে। আমি এখানে বিবাহ করিয়াছি এবং আমার একটি কন্যা হইয়াছে। আমার অবর্তমানে আমার সহধর্মিণী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে, যেমন সারা জীবনে আমার প্রতি করিয়াছ।"[৮০] সংগ্রামী জীবনে চলার পথেই তাঁর প্রেম। এই প্রেমকে মর্যাদা দিয়ে চলার পথেই বিবাহ, একটি সন্তানেরও জন্ম। জাপান যাত্রার আগে সদ্যোজাত সন্তানকে তিনি কয়েক দিনের জন্য দেখেছিলেন মাত্র। সংগ্রামের পথেই তিনি এগিয়ে গেলেন, সামান্যতম দুর্বলতা তো দূরের কথা, মুহূর্তের জন্যও তিনি সন্তান বা স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকাননি। এও এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

নেতাজির স্ত্রী কী উন্নত চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন এবং নেতাজিকে কী গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, সেটা বোঝা যায়, অশেষ দারিদ্র ও কষ্টের মধ্যে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত ভিয়েনায় তিনি কন্যাকে লালন পালন করেছেন, কিন্তু নেতাজি সম্পর্কে কোন অনুযোগ-অভিযোগ ব্যক্ত করার কথা মুহূর্তের জন্যও ভাবেননি। পরবর্তীকালে নেহেরু সরকারের আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব এবং আই এন এ ফান্ড থেকে সাহায্যের প্রস্তাব সবিনয়ে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এদেশে বিবাহ নিয়ে নেতাজিভক্ত কিছু উন্মাদ ও বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে পারে এবং তাতে নেতাজি ও তাঁর মর্যাদাহানি ঘটতে পারে — হয়তো এই আশঙ্কায় বারবার আমন্ত্রণ পেয়েও এমিলি শেঙ্কল এদেশে আসেননি। নেতাজির গৌরবময় স্মৃতিকে বুকে বহন করেই সারা জীবন থেকেছেন। সন্তানকে নেতাজির শিক্ষায় যথার্থ মানুষ করতে পেরেছিলেন বলেই প্রশ্নের উত্তরে কন্যা অনিতা বলতে পেরেছেন, "তিনি তো আমাদের কোন মিথ্যা আশা দেননি, বরাবরই বলেছেন যে, স্বদেশই তাঁর প্রথম প্রেম, দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই তাঁর জীবনের কাজ ...যুদ্ধে কত নারী বিধবা হয়েছেন, কত শিশু পিতৃহীন হয়েছে। তিনি যে ফিরতে পারেন নি, তার জন্য তো তাঁকে দোষী করা যায় না।"[৮১] শুধু তাই নয়, নেতাজির কন্যা অনিতা বসু ইউরোপে পালিত হলেও মায়ের শিক্ষায় পিতা সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও জীবন সংগ্রামের প্রতি গভীর

৮০ ঃ সুভাষচন্দ্র রচনাবলি - ৬ষ্ঠ খণ্ড ৮১ ঃ দেশ, নেতাজি সংখ্যা - ১৯৯৭

শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এদেশে বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রদত্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়। এর দ্বারা বোঝা যায় নেতাজির স্ত্রী সংস্কৃতিতে ও চরিত্রে কতটা উচ্চমানের অধিকারিনী ছিলেন। যুদ্ধশেষে সুভাষচন্দ্রের মেজদা শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁর স্ত্রী বিভাবতী বসু উভয়ে ইউরোপে গিয়ে নেতাজির স্ত্রী ও কন্যাকে গভীর ভালবাসায় ও সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও আমাদের দেশে এখনও কিছু অন্ধ, উন্মাদ আছে যারা নেতাজি বিবাহ করেছেন এই সত্য স্বীকার করতে চায় না। এর দ্বারা যে তাঁরা নেতাজিকেও অশ্রদ্ধা করছেন, তা বোঝার মতো ক্ষমতাও তাঁদের নেই।

ব্রিটিশ ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হল কেন

এ দেশে পাঠ্যপুস্তকেও নানাভাবে প্রচার করে এই ধরণের ভুল ধারণাকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে যে, গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের শক্তিতেই ভারত স্বাধীন হয়েছে। এটা আদৌ ঠিক নয়। কারণ প্রায় একই সময়ে বার্মা ও শ্রীলঙ্কা স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু সেখানে তো অহিংস আন্দোলন ছিল না। ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল, প্রধানত দুইটি কারণে। প্রথমত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এত বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল যে, পুরানো কায়দায় উপনিবেশগুলির উপর আর আধিপত্য রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের গৌরবময় ভূমিকা, তার প্রভাবে উদ্দীপিত চীন-ভিয়েতনামে মুক্তি সংগ্রামে কমিউনিস্টদের বিপুল অগ্রগতি, অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ার এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষে ১৯৪২ সালে সশস্ত্র অভ্যুত্থান, পরবর্তীতে নেতাজির নেতৃত্বে আই এন এ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে সমগ্র দেশে বিপুল উদ্দীপিত গণজাগরণ ও ১৯৪৫ সালে নৌ-বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকারকে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করেছিল।

একথার স্বীকৃতি তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলির সাথে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণীভূষণ চক্রবর্তীর আলোচনায় পাওয়া যায়। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে ফণীভূষণ চক্রবর্তী এক চিঠিতে লিখছেন, "আমি যখন (১৯৫৬) অস্থায়ী রাজ্যপাল ছিলাম, তখন যিনি আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়া ভারত হইতে ইংরাজ শাসন সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সেই লর্ড এটলি ভারত ভ্রমণে আসিয়া কলিকাতায় রাজভবনে দুইদিন অবস্থান করেন। তখন তাঁহার সহিত আমার ইংরাজের ভারত হইতে চলিয়া যাইবার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, গান্ধীর 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলন তো ১৯৪৭ সালের বহু পূর্বেই মিয়াইয়া গিয়াছিল, ১৯৪৭ সনে এমন কোনও পরিস্থিতি বর্তমান ছিল না যাহার জন্য ইংরাজদের তাড়াহুড়া করিয়া এ দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল — তবে তাহারা গেল কেন? উত্তরে এটলি কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নেতাজি সুভাষ

চন্দ্র বসু কর্তৃক ভারতের স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সাথে যুক্ত দেশীয় সেনানীদের ইংরাজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া। আলোচনার শেষের দিকে আমি লর্ড এটলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইংরাজদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীর কার্যকলাপের প্রভাব কতটা ছিল? এই প্রশ্ন শুনিবার পর এটলির ওষ্ঠদ্বয় একটা অবজ্ঞাসূচক হাস্যে বিস্তৃত হইল এবং তিনি চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন mi-ni-mal (নগণ্য)।"[৮২] ফলে এ কথা একদম ঠিক নয় যে গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের চাপেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছিল।

বর্তমানে শাসকদলগুলির দেউলিয়াপনা

আজ এমন একটা সময়ে আমরা নেতাজি জয়ন্তী করছি, যখন সমগ্র দেশ, জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক সমস্ত দিক থেকেই ভয়াবহ সংকটে নিমজ্জিত, যা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুগে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখত। 'স্বদেশী' এই শব্দটা উচ্চারিত হলে নিরক্ষর গ্রামীণ মায়েদেরও শ্রদ্ধায় আবেগে মুখ চোখ উজ্জ্বল হত। সেদিন বিপ্লবীদের তো বটেই, গান্ধীবাদীদেরও রাজনীতির মধ্যে দেশ ও জনগণের প্রতি একটা দায়িত্ব কর্তব্যবোধ ছিল, সততা-নিষ্ঠা ও ত্যাগের মানসিকতা ছিল, তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যা কিছু করছি দেশের কল্যাণের জন্য, জনগণের স্বার্থেই করছি, আদর্শ ও পথ সঠিক বা বেঠিক যাই হোক না কেন।

আজ পুঁজিবাদ শাসিত ভারতবর্ষে বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলির নাম-ঝান্ডা যাই হোক সাধারণ মানুষ তাদের শ্রদ্ধা বিশেষ করে না, কোনও আস্থা রাখে না। কংগ্রেস, বিজেপি, সি পি এম, আঞ্চলিক দলগুলি কখনও একক কখনও যুক্তভাবে রাজ্যে রাজ্যে বা কেন্দ্রে সরকার চালিয়েছে, বিজেপি এখন চালাচ্ছে। মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এদের কাজকর্ম, হালচাল দেখে তিক্ত অভিজ্ঞতায় দেখেছে এদের নেতারা অসৎ, মিথ্যাবাদী, চরম দুর্নীতিগ্রস্ত, ঠকবাজ, এদের নীতি-আদর্শের কোন বালাই নেই, কথার কোন দাম নেই। ভোটের আগে যা করবে বলে, গদিতে বসে ঠিক উল্টোটা করে। এদের একমাত্র লক্ষ্য যেনতেন প্রকারেণ গদী দখল আর নিজেদের ধন-দৌলত বাড়ানো। স্বদেশী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা দেশের জন্য ত্যাগ করতেন, আর এরা বড় বড় পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের গোলামি করে তাদের দেওয়া বিপুল অর্থে ও মন্ত্রী হিসাবে পাবলিক মানি আত্মসাৎ করে চরম ভোগ-বিলাসী জীবনে মত্ত হয়ে আছে। যেখানে দেশ ধনি-গরীবে, মালিক-শ্রমিকে, শোষক-শোষিতে শ্রেণি বিভক্ত সেইখানে সরকারে আসীন এই দলগুলি শোষক পুঁজিপতিদের শোষণের স্বার্থেই কাজ করে চলেছে, গরীব শোষিত জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে। 'গণতন্ত্র' শব্দটা শুধু আছে, কিন্তু জনগণের কোন ভূমিকা নেই। 'জনগণের রায়' নয়, 'পুঁজিপতিদের মানি পাওয়ার-মিডিয়া পাওয়ার-মাসল পাওয়ার-ব্যুরোক্রেটিক পাওয়ারের রায়'-ই নির্ধারণ

৮২ ঃ (পশ্চিমবঙ্গ - নেতাজি সংখ্যা - ১৯৯৭)

করছে কে ভোটে জিতবে, কারা মন্ত্রী হবে, সরকার কিভাবে চলবে, কি কি আইন হবে। বহু বিঘোষিত পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের মতো আমাদের দেশেও পার্লামেন্টারি ফ্যাসিস্ট অটোক্র্যাসিতে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানের যুগে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যতটা প্রগতিশীলতা ছিল, ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রতিবাদের অধিকার, গণআন্দোলনের অধিকার ছিল, আজ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে সব কিছুই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পূর্বে লেজিসলেটিভ-এক্সিকিউটিভ-জুডিসিয়ারির পারস্পরিক সম্পর্কে যে আপেক্ষিক স্বাধীনতা ছিল, এখন তার লেশমাত্র নেই। সবকিছুই পুঁজিবাদের স্বার্থে মন্ত্রীসভা ও এক্সিকিউটিভই কন্ট্রোল করছে। এমনকি গণতন্ত্রের নামে যতটুকু ছিল তাকেও ধ্বংস করার ক্রিয়া চলছে, বিচার বিভাগকেও জো হুকুমে পরিণত করা হচ্ছে।

কংগ্রেস শাসনকাল থেকেই এসব জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ শুরু হয়েছে যেটা বিজেপি শাসনকালে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। যে কোন আন্দোলনকে লাঠি-গুলি-বেয়নেট চালিয়ে নির্মমভাবে দমন করা হচ্ছে, যেকোন প্রতিবাদীকে 'অ্যান্টি ন্যাশনাল' তকমা লাগিয়ে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হচ্ছে, বিরুদ্ধতার কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘ শাসনকালে যেখানে দুই-তিন বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে, এখন সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষজনিত বিভেদ ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শত শত গণহত্যা, বিপুল সম্পত্তি ধ্বংস, অসংখ্য নারী ধর্ষণ প্রায় নিত্ত-নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুত্বের নামে একদিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর এবং অন্যদিকে দলিতদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চলছে। আমরা মার্কসবাদী হিসাবে বিজ্ঞানধর্মী ও নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু মার্কসবাদ ধর্মের অভ্যুত্থানের যুগে তার প্রগতিশীলতা ও ধর্মপ্রচারকদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে শ্রদ্ধার সাথে গণ্য করে। আমরা বলিষ্ঠভাবে এ কথা বলতে চাই, ধর্মের নামে হিন্দুত্ববাদীরা যা করছে, সে সব চূড়ান্ত অধর্ম ও হিন্দুধর্ম বিরোধী। এই হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারীরা চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের প্রচারিত ধর্মকে কলুষিত করছে। চৈতন্য সব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন, রামকৃষ্ণ মন্দিরে পূজা করেছেন, মসজিদে নামাজ পড়েছেন, গির্জায় প্রার্থনা করেছেন, তিনি বলেছেন—সব ধর্মই এক, এক ভগবানকে ভিন্ন নামে ডাকে ও ভিন্ন নামে প্রর্থনা করে, যেমন কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি আবার কেউ বলে ওয়াটার। বিবেকানন্দ তো এমন পর্যন্ত বলেছেন, "...আমরা শুধু সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করি না, সব ধর্মকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। ...আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানেই নিয়ে যেতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই, অথচ সে কাজ করতে হবে বেদ-বাইবেল ও কোরাণকে সমন্বয় করেই...।"[৮৩] তিনি এমনও বলেছিলেন,"...এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খৃষ্টান এবং নিজে মুসলমান হতে পারি।"[৮৪] এই তিন জন কখনও দাবি করেননি যে

৮৩, ৮৪ ঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খন্ড

অযোধ্যায় রামের জন্মস্থানে বাবরি মসজিদ স্থাপিত হয়েছে এবং তাকে ভেঙে রাম মন্দির করতে হবে। এমনকি বিবেকানন্দ রাম ও কৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে পৌরাণিক বলেছেন। বাল্মিকীর রামায়ণে ও তুলসী দাসের রামায়ণে (তুলসী দাসের সময় বাবরি মসজিদ ছিল) কোথাও উল্লেখ নেই যে বাবরি মসজিদ রামের জন্মস্থানে স্থাপিত হয়েছে। অথচ স্রেফ রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলিম মৌলবাদী তালিবানরা যেমন আফগানিস্থানে বামিয়ানে ঐতিহাসিক বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করেছে, তেমনি হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী মৌলবাদী বিজেপি-আর এস এস, ঐতিহাসিক স্থাপত্য বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে রাম মন্দির স্থাপন করছে। যিশুখ্রিস্ট-হজরত মহম্মদ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে এই বর্বরতা ও অধর্মের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই প্রতিরোধের ডাক দিতেন। জনগণকে এই ধর্মীয় মৌলবাদ প্রতিরোধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিশ্ব সমাজতন্ত্র ধ্বংস হওয়ায়, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন দুর্বল হওয়ায়— সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের ষড়যন্ত্রে এই ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে এবং সভ্যতা বিধ্বংসী তাণ্ডব চালাচ্ছে। এইভাবে জনগণ যাতে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে এবং নির্বাচনে 'ভোট ব্যাঙ্ক' তৈরি করা যেতে পারে তার জন্য সমগ্র দেশে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-উপজাতি বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করে সারা দেশে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

একদিকে পুঁজিপতিদের সম্পদের পাহাড়
অন্যদিকে জনসাধারণের দুঃসহ দারিদ্র

অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতিও ভয়াবহ। কংগ্রেস যেমন 'দারিদ্র্য দূরীকরণ', 'গরীবি হঠাও' ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় বসে যা করেছে, বিজেপি তার পরিবর্তে 'আচ্ছে দিন', 'বছরে দু'কোটি চাকুরি', কালো টাকা উদ্ধার করে প্রতি পরিবারে ১৫ লক্ষ টাকা পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি বলে সেই পথে দেশকে আরও দুর্বিষহ দুর্গতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। ২০২০ সালের গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স অনুযায়ী ১০৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৯৪। এদেশে ৬৭ শতাংশ মানুষ খুবই দরিদ্র, প্রতিদিন ২ কোটি মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে থাকে, প্রতি বছর ১ কোটি অনাহারজনিত কারণে মারা যায়, প্রতি ঘন্টায় ৫ জন কৃষক ও শ্রমিক আত্মহত্যা করে। ১০ শতাংশ ধনী দেশের ৭৪.৩ শতাংশ সম্পদের মালিক যেখানে ৯০ শতাংশ মাত্র ২৫.৭ শতাংশ সম্পদের মালিক। এই ৯০ শতাংশের মধ্যে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তবানদের বাদ দিলে প্রায় ৮০ শতাংশ সর্বহারা-অর্ধ সর্বহারা। ছাঁটাই ও বেকার সমস্যাও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে পার্লামেন্টে সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ৬ লক্ষ ৮০ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়েছে, ইতিমধ্যে এই সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। কারণ দেশে দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। ফলে কোটি কোটি মানুষ বেকার-কর্মচ্যুত-অর্ধ বেকার। এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে পার্মানেন্ট চাকুরি অবলুপ্ত করা হচ্ছে, খালি পোষ্টে নিয়োগ বন্ধ করা হচ্ছে এবং কর্মী সংকোচন করা

হচ্ছে, কন্ট্রাকটার দিয়ে সামান্য মজুরিতে অস্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারী দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। অভাবের তাড়নায় গ্রাম থেকে, শহরের গরীব পাড়া থেকে লক্ষ লক্ষ যুবক পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে এ শহরে ঐ শহরে এমনকি বিদেশেও ছুটছে যদি হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে দু'পয়সা রোজগার করা যায়। ২০০/৩০০ পিয়ন, চাপরাসি পোস্টের জন্য লক্ষ লক্ষ আবেদন পত্র জমা পড়ছে যাদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, পোস্ট গ্রেজুয়েট, গ্রেজুয়েট পাশ করা যুবকেরাও আছে। এই হচ্ছে বিজেপি-র উন্নয়নের এক চিত্র, অন্যদিকে বিজেপি শাসনে উন্নয়নের আরেক চিত্রও আছে। এই দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের মুনাফার পরিমাণ বেড়েই চলেছে। বিজেপির পরম মিত্র মুকেশ আম্বানি এই লক ডাউন পিরিয়ডেই প্রতি ঘন্টায় ৯০ কোটি টাকা আয় করেছে। গত বছরে তার মোট আয় ২,৭৭,৭০০ কোটি টাকা বেড়ে ৬,৫৮,৪০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়ে তিনি এশিয়ার এক নম্বর ধনী হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। অন্য আর এক মিত্র আদানির ৫০,৪০০ কোটি টাকা থেকে পাঁচ বছরে ১ কোটি ১০ লক্ষ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছেন। এরা কী উপায়ে কার আশীর্বাদে এসব করতে পেরেছেন একবার ভেবে দেখুন। সুইজারল্যান্ড ও বিদেশের নানা ব্যাঙ্কে ৩০০ লক্ষ কোটি কালো টাকা মজুত আছে অথচ সরকার কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন, ভেবে দেখুন। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৬ লক্ষ কোটি টাকা, বাজেটে ঘাটতি ৮,৭০,৩৪৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে এই সরকারই সদয় হয়ে বৃহৎ পুঁজিপতিদের ১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দিয়েছে, ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ শোধ বাতিল করেছে। ফলে বুঝে নিন, এই সরকার কার স্বার্থে কাজ করছে? একদিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের ক্রমবর্ধমান বিপুল সম্পদ-ঐশ্বর্য, অন্যদিকে অধিকাংশ সাধারণ মানুষের দুঃসহ চরম দারিদ্র। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে হাজারে হাজারে অসহায় দরিদ্র বাবা-মা সন্তান বিক্রি করে দিচ্ছে, যারা শিশু শ্রমিক হয়ে দেশে বিদেশে চরম বর্বরতার শিকার হচ্ছে, মেয়েদের বিক্রি করে দিচ্ছে যারা দেহ বিক্রির বাজারের পণ্যে পরিণত হচ্ছে, এমনকি কর্মচ্যুত অসুস্থ স্বামী, ক্ষুধার্ত সন্তান এই অবস্থায় ঘরের বৌ-মেয়েরা অন্ধকারে স্টেশনে, গঞ্জে রাস্তায় দাঁড়ায় দেহ বিক্রি করে কিছু রোজগারের জন্যে। লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন, গৃহহীন, ফুটপাথবাসী শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় অশ্রয় নেয়। এদের সন্তানেরা ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত ধনীদের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি করে, অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মরে। কে এদের খোঁজ রাখে। এ চিত্র চরম দুঃখের, ব্যথার, অন্ধকারের!

এই অবস্থায় যাতে প্রশ্ন না উঠতে পারে এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য কে দায়ী? যাতে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণি ও শাসক দলগুলিকে দায়ী না করতে পারে, তার জন্য বিজেপি এবং আর এস এস এক ভয়ঙ্কর স্কিম কার্যকর করছে। যে দেশে একদিন রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ফুলে-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রেমচাঁদ-সুব্রহ্মণিয়ম ভারতী-নজরুলরা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা দূর করে আধুনিক যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে তোলার জন্য নবজাগরণের মশাল জ্বালিয়ে ছিলেন, আজ সেই দেশকেই

গীতা-মনু সংহিতা-রামায়ণ-মহাভারতের ধর্মীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত করা হচ্ছে। অন্ধ বিশ্বাস জাগানো হচ্ছে যাতে জনগণ জীবনের সংকটের জন্য পুঁজিবাদ ও সরকারকে দায়ী না করে নিজেদের 'অদৃষ্টের লিখন', 'পূর্ব জন্মের পাপের ফল' হিসাবে 'বিধাতার বিধান' হিসাবে গণ্য করে। তাহলে প্রতিবাদ-আন্দোলন হবে না। আধুনিক বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে বৈজ্ঞানিক মনন যাতে গড়ে না ওঠে সেজন্য প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্য জাগানোর উদ্দেশ্যে হাস্যকর দাবি করা হচ্ছে যে গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গ, আচার্য জগদীশচন্দ্ররা নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি, সবই হাজার হাজার বছর আগে ভারতীয় মুনি-ঋষিদের শাস্ত্রে লিখিত আছে। প্রধানমন্ত্রী তো এমনও দাবি করেছেন, গণেশের মূর্তিই প্রমাণ করে প্রাচীন যুগে এদেশে প্লাস্টিক সার্জারি ছিল। এসবই করা হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ ও কারিগরি বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফ্যাসিস্ট মানসিকতা গড়ে তোলার হীন প্রয়োজনে। ফ্যাসিস্ট হিটলারও উগ্র জার্মান ও আর্য সেন্টিমেন্ট জাগাতে গিয়ে এতটা পারেনি। এরপর হয়ত বিজেপি দাবি করবে আধুনিক শিল্প, সংবিধান, বিচার বিভাগ, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ইত্যাদি সবই প্রাচীন ভারতে ছিল। ইতিহাসকেও বিকৃত করা হচ্ছে, পাঠ্য সিলেবাস পাল্টানো হচ্ছে। এখানে স্মরণ করানো দরকার যে, ফ্যাসিস্ট হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিতে ইহুদিদের ওপর নৃশংস অত্যাচার যখন চলছে এবং তার বিরুদ্ধে মনীষী রমাঁ রলাঁ, আইনস্টাইন, বার্ণার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদরা এবং বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রেমীরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, তখন হিটলারের পক্ষে দাঁড়িয়ে আর এস এস-এর সরসংঘচালক গোলওয়ালকর লিখেছিলেন, "নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতিকে কলুষমুক্ত করতে জার্মানি গোটা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে সেমিটিক জাতি ইহুদিদের দেশ থেকে বিতাড়ন করছে। জাতিত্বের গর্ব এখানে তার সর্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ... এই শিক্ষা হিন্দুস্তানে আমাদের গ্রহণ করা এবং তার থেকে শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন।"[৮৫] ধর্মান্ধতা জাগানো, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি, ফ্যাসিবাদী মনন তৈরি ছাড়াও আরেকটি আরও মারাত্মক আক্রমণ শোষক শ্রেণি ও শাসক দলগুলি চালিয়ে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ সামাজিক-পারিবারিক দায়িত্ববোধ-কর্তব্যবোধ-ন্যায় অন্যায় বোধ, স্নেহ-মায়া-মমতা-হৃদয়বৃত্তি মানব সভ্যতার এই মূল্যবান সম্পদকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মানুষকে অমানুষে পরিণত করা। ব্রিটিশ শাসন যুগেই পুঁজিবাদ কীভাবে মনুষ্যত্ব বিনষ্ট করছে, তা দেখে শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্র মর্মস্পর্শী ভাষায় বলেছিলেন, "সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কতবড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে এ দু'টা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল।" কারণ, "মানুষকে পশু করিয়া লইতে না পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।" তারপরই দুঃখ করে বলেছিলেন, "মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে।" আজ থেকে প্রায় কত বছর আগে তিনি পুঁজিবাদের স্বরূপ দেখে এই উক্তি করেছিলেন। তারপর ১৯৭৪ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ

৮৫ ঃ উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড

পুঁজিবাদী শাসন দেখে গভীর উদ্বেগে বলেছিলেন, "...না খেয়ে থেকেও, শোষণে জর্জরিত হয়েও, দিনের পর দিন অর্ধভুক্ত ও অর্ধনগ্ন থাকার পরও একটা জাতি উঠে দাঁড়াতে পারে, লড়তে পারে, লড়বার শক্তি অর্জন করতে পারে, সংগঠিত হতে পারে, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে—যদি সেই জাতির নৈতিক বল অটুট থাকে এবং জনসাধারণের সামনে একটি সঠিক আদর্শ খাড়া থাকে। ...ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায় জাতির সেই নৈতিক চরিত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।"[৮৬]

নেতাজির উত্তরসূরী হিসাবে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে

আজ ২৩ জানুয়ারি উদযাপন সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে একটা কথা বার বার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে, ব্যথা দিচ্ছে ;আমি জানি আপনাদের মধ্যে যাঁরা বয়সে প্রবীণ, তাঁদেরও ভাবাচ্ছে, ব্যথা দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে, আজ এই ২৩ জানুয়ারি, এই দিনটির সাথে যাঁর স্মৃতি বিজড়িত তাঁকে এ দেশের কজন স্মরণ করছে? আজ তো নেতাজি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। অথচ একদিন ছিল—এই ২৩ জানুয়ারি দেশবন্ধু-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, আরও অনেক বয়োজ্যেষ্ঠরা নেতাজিকে আশীর্বাণী পাঠাতেন, আর সারা দেশে অজস্র সভা-সমাবেশ হত। বিপ্লবী কবি নজরুলরা গান গেয়ে শ্রদ্ধা জানাতেন। সুভাষচন্দ্র আসছেন খবর পেলে ঘোমটা পরা গ্রাম্য বধূরাও একটু দেখবার জন্য রাস্তার পাশে ব্যাকুল হয়ে দাঁড়াতেন। আজ সেই দিনগুলি কোথায় হারিয়ে গেল? শুধু কি আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্রকেই ভুলে গেছি? বি জে পি, কংগ্রেস, সি পি এম ও তৃণমূল সহ অন্যান্য অঞ্চলিক সরকারি দলগুলির নেতাদের কল্যাণে আমরা সে যুগের সমস্ত বড় মানুষদেরই ভুলে গেছি। তাই আজ এ দেশে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ বিস্মৃত নাম। ক্ষুদিরাম-সুভাষচন্দ্র-ভগৎ সিংকে এ দেশের ছাত্র-যুবকরা জানে না, জানে না শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, নজরুলকে। আজ এদেশের এমনই অগ্রগতি ঘটেছে! এ কি এমনি এমনি ঘটল? এর পিছনে আছে গভীর ষড়যন্ত্র। এ দেশের পুঁজিপতিশ্রেণি, শোষকশ্রেণি চায় না এ দেশের ছাত্র-যুবরা অতীতের এই সমস্ত বড় মানুষদের থেকে শিক্ষা নিক, তাঁদের চরিত্র এবং সংগ্রামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হোক। কারণ, সংকটগ্রস্ত, বিপ্লবভীত পুঁজিবাদের আজ প্রয়োজন ছাত্র-যুবকদের চরিত্র-মনুষ্যত্ব খতম করা। যে কথা একদিন গভীর ব্যথায় এবং দুঃখে আমাদের নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, "একটা জাতি, একটা দেশের শোষিত জনগণ অভুক্ত থেকেও লড়ে, মিলিটারি ও পুলিশের হাজার অত্যাচার, নিপীড়ন সত্ত্বেও লড়ে, যদি তার মনুষ্যত্ব থাকে, যদি তার চরিত্র থাকে, যদি থাকে তার নৈতিক বল।" ভারতবর্ষের বিপ্লবভীত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের মদতে সরকারি দলগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় চলছে কুৎসিত সিনেমা, ব্লু-ফিল্ম, নোংরা নাটক-যাত্রার জোয়ার, কদর্য যৌন সাহিত্যের ছড়াছড়ি। মদ খাও, গাঁজা খাও, নেশা কর, জুয়া খেলো, নারীদেহ নিয়ে কুৎসিত আলোচনায় মত্ত থাকো, এর মধ্যেই

৮৬ ঃ শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে

ছাত্র-যুব সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত রাখার ষড়যন্ত্র। আর এখানেই মরছে যৌবন, মরছে মনুষ্যত্ব, মরছে বিবেক। পুঁজিবাদ জানে, মানুষকে পশু না বানাতে পারলে, প্রবৃত্তির দাস না বানাতে পারলে এই শোষণমূলক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না, আন্দোলন, বিপ্লব হবেই, কামান-বন্দুক, গোলা-বারুদ, কোনও কিছু দিয়ে দাবিয়ে রাখা যাবে না। আত্মমর্যাদাবোধ থাকলে, বিবেক থাকলে যৌবনের তেজ নিয়ে মানুষ আবার উঠে দাঁড়াবে, যেমন করে যৌবন একদিন ক্ষুদিরামের মধ্য দিয়ে মাথা তুলেছিল। ক্ষুদিরামকে নেতারা যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি পারবে'?—ভাষায় উত্তর দেননি, আনন্দে মুখ উদ্ভাসিত হয়েছিল—'ভারতবর্ষে এত যুবক থাকতে এই মৃত্যুযজ্ঞে আমার আহ্বান এসেছে, আমি সম্মানিত।' এই যথার্থ যৌবনের মর্যাদাবোধ। প্রশ্ন করেননি, 'আমাকে পুলিশ ধরলে, কে দেখবে, আমার বাড়ির কী হবে?' মুখ দেখেই নেতারা বুঝেছিলেন—এ-ই পারবে। ফাঁসির আদেশ শুনেও ক্ষুদিরাম হেসেছিলেন। ফাঁসির রজ্জু যখন ক্ষুদিরামের শ্বাসরোধ করছে, তখনও ক্ষুদিরাম হাসছেন। এই সেই যৌবন যা মৃত্যুকে পরাস্ত করতে জানে। ফাঁসির মঞ্চে উঠবার মুহূর্তে শহিদ ভগৎ সিং দণ্ডায়মান ইংরেজ অফিসারকে বলেছিলেন, "ইউ আর এ লাকি ম্যান', বিস্মিত সাহেব প্রশ্ন করেছিলেন, 'হোয়াই'? ভগৎ সিং জবাব দিয়েছিলেন, "ইউ উইল সি হাউ ইন্ডিয়ান রেভেলিউশনারিজ এমব্রেইস গ্যালোস উইথ স্মাইলিং ফেস", এঁদের দেখেই নজরুল একদিন লিখেছিলেন—"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।" এইসব চরিত্র যদি আজও ছাত্র-যুবকদের অনুপ্রাণিত করে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র যদি অনুপ্রাণিত করে, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-শরৎচন্দ্র-নজরুল—এঁদের শিক্ষা ও সংগ্রাম যদি অনুপ্রাণিত করে, তা হলে পুঁজিবাদ জানে, টাকা দিয়ে, লোভ দেখিয়ে, লালসা জাগিয়ে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে, গুলিগোলা চালিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে রোখা যাবে না। তাই এই ষড়যন্ত্র, তাই এই আক্রমণ। একদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসে, এমনকি বিশ্বের ইতিহাসে এই বাংলাদেশের কী স্থান ছিল, কলকাতা মহানগরীর কী মর্যাদা ছিল, যার জন্য গোখলে গভীর শ্রদ্ধায় একদিন বলেছিলেন, "হোয়াট বেঙ্গল থিংক্স টুডে, ইন্ডিয়া থিংক্স টুমরো", যখন রেল আসেনি, বিদ্যুৎ আসেনি, রেডিও-টেলিভিশন আসেনি, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে রেনেশাঁর মশাল জ্বালিয়ে এসেছিলেন রামমোহন রায়, এসেছিলেন মেদিনীপুর থেকে হাঁটা পথে বিদ্যাসাগর। সাহিত্যের জগতে এসেছিলেন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, নজরুল; বিজ্ঞান সাধনায় এসেছিলেন জগদীশ বোস, প্রফুল্ল রায়, তাঁদের সুযোগ্য ছাত্র সত্যেন বোস, সি ভি রমন, মেঘনাদ সাহা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসেছিলেন দেশবন্ধু, বিপিন পাল ও আরও অনেকে। নানা প্রদেশ থেকে, জেলা থেকে, গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা কলকাতায় আসত, আর কলকাতার বড় মানুষদের বার্তা বহন করে নিয়ে যেত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নানা প্রদেশে। এটা অন্য কোন কারণে নয়, কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজধানী হওয়ায় এখানেই পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো প্রথম পৌঁছেছিল। তারই প্রভাবে কলকাতা বিকশিত হয়েছিল। সেদিন সমগ্র দেশকে এই শহর পথ দেখিয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে। সেদিন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-

সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনে, চরিত্রে-মনুষ্যত্বে এই কলকাতার প্রাণ ছিল, রূপ ছিল, ঐশ্বর্য ছিল। আজ কোথায় সেই কলকাতা? সে আজ রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত — বিবর্ণ, বিকৃত, মৃত — তার গলিত শবদেহের বিষাক্ত দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, চতুর্দিককে কলুষিত করছে। আজকের এই কলকাতা দেখলে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ কেঁদে উঠতেন, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, নজরুল যন্ত্রণায় ছটফট করতেন।

ব্রিটিশ পদানত যেদেশে একদিন নবজাগরণের উদ্ভাসিত সূর্যালোকের স্পর্শে, স্বদেশী আন্দোলনে উদ্দীপিত সংগ্রামের প্রভাবে যৌবন জেগে উঠেছিল, নবজাগরণের পুরোধাদের ও স্বদেশী আন্দোলনের বীর যোদ্ধাদের জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিল, দলে দলে মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনায়, মুক্তি সংগ্রামে নিঃস্বার্থ আত্মদানে ব্রতী হয়েছিল, আজ সেই দেশ কোথায়! সেই দেশ আজ মৃতপ্রায়, বিবর্ণ, বিকৃত, দুর্গন্ধময়।

শোষক শ্রেণি ও শাসক দলগুলির ষড়যন্ত্রে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-জ্যোতিবা ফুলে-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রেমচাঁদ-সুব্রহ্মনিয়াম ভারতী- নজরুলরা, দেশবন্ধু-তিলক-লালা লাজপৎ-ক্ষুদিরাম-সূর্য সেন-ভগৎ সিং-চন্দ্রশেখর আজাদ-প্রীতিলতা-আসফাকউল্লারা সবাই আজ বিস্মৃতির অতলে। এখন ছাত্র-যুব শক্তির কাছে প্রচারে আদর্শ হিসাবে উপস্থিত করা হচ্ছে ফিল্মস্টার ও প্লেয়ারদের জীবন কাহিনী, অন্যদিকে মদ-ড্রাগ এডিকশানে, জুয়া-সাট্টায়, ব্লু ফিল্মে, কদর্য যৌন সাহিত্যে, যৌনতা নিয়ে কুৎসিত চর্চায় নিজ্জিত রাখা হচ্ছে। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। স্কুলের ক্লাস ফাইভ-সিক্সের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত এভাবে নষ্ট হচ্ছে। পারি না পারি যেভাবেই হোক টাকা রোজগার আর নোংরা ফূর্তি করা—এটাই এখন জীবনের লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালবাসা-বিয়ের ছলনা করে ঘর থেকে বের করে বিক্রি করা, নারী পাচার, টাকার বিনিময়ে খুন করা হতে শুরু করে এমন কোন কুকর্ম বাকি নেই, যাতে রোজগার হতে পারে। চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা সমাজ দেহের স্তরে স্তরে এমনকি পারিবারিক জীবনকেও ধ্বসিয়ে দিচ্ছে। অসহায় বৃদ্ধ বাবা-মাকে সন্তান খুন করে হোক, মারধর করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে হোক সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছে, না হয় কিছু টাকা দিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে চালান করে দিচ্ছে—এই হচ্ছে পিতৃত্বের-মাতৃত্বের প্রতি কর্তব্যবোধ। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনেও সুখ-শান্তি-স্নেহ-মমতা বিলুপ্ত প্রায়, পারস্পরিক সন্দেহের বিষবাষ্পে পরিবেশ দূষিত, ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি, ছাড়াছাড়ি, এমনকি বধু হত্যা-বধু নির্যাতন প্রায় ঘরে ঘরে, এ অবস্থায় শিশুরা কিভাবে মানুষ হতে পারে!

সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও হত্যাকান্ড। প্রতিদিন গ্রামে শহরে শত শত ধর্ষিতা নারী আর্তনাদ করছে। ৯০ বছরের বৃদ্ধা নারী হতে শুরু করে ৬ মাসের শিশু কন্যা পর্যন্ত ধর্ষিতা হচ্ছে। এমনকি জন্মদাতা পিতার বিরুদ্ধে কন্যা, শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী পর্যন্ত এই অভিযোগ করছে। পশু জগতেও এসব ঘটেনা যা আজ ঘটছে। এই ধর্ষণকারীরা পশুও নয়, মানুষও নয়, মানবদেহী এক বিচিত্র জীব, বর্তমান পুঁজিবাদের সৃষ্টি। এই যদি সভ্যতা হয়, নরক কাকে বলে!

আজকের ভারতবর্ষের এই ভয়াবহ চিত্র দেখে নেতাজি কী বলতেন, কী

করতেন। সেটা বুঝেই কর্তব্য নির্ধারণ করা ও দায়িত্ব পালন করাই নেতাজির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। একথাও আজ স্মরণ করতে হবে যে নেতাজি সেদিন বলেছিলেন, "আমার ছেলেবেলায় আমি ব্রিটিশকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই সব চাইতে বড় কর্তব্য বলে মনে করতাম। পরে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম, ব্রিটিশকে তাড়ালেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না। ভারতবর্ষে নতুন সমাজ ব্যবস্থা চালু করার জন্য আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন।"[৮৭]

তাঁর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে ১৯৩০ সালে বিপ্লবী বারীন্দ্র ঘোষকে এক চিঠিতে নেতাজি এমনও লিখেছিলেন যে, "এত বছর ধরে আমরা স্বাধীনতা বলতে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বোঝাতাম। কিন্তু এখন আমাদের ঘোষণা করতে হবে যে, আমরা শুধু জনগণকে রাজনৈতিক শৃঙ্খল থেকেই মুক্ত করব তা নয়, আমরা তাদের সব রকম শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করব। স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য হবে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তিন ধরনের অত্যাচার থেকে মুক্ত করা। যখন সব ধরনের শৃঙ্খল দূর করা যাবে, তখন কমিউনিজমের ভিত্তিতে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল লক্ষ্য হবে শ্রেণিহীন স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।"[৮৮] নেতাজি মার্কসবাদী না হয়েও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সাফল্যে আকৃষ্ট হয়ে এতদূর পর্যন্ত ভেবেছিলেন। নেতাজি গভীর প্রত্যাশা নিয়ে বলেছিলেন, "কোটি কোটি ভারতবাসীর পক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের মুক্তির প্রয়োজনে আমি জীবন দিয়ে যাব। যদি সত্যের কোন মূল্য থাকে, এদেশের মানুষ একদিন বুঝবে আমার হৃদয়ের কথা।"[৮৯]

তিনি তো জীবন দিয়ে গেছেন, আজ আমাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করতে হবে, সত্যিই কি আমরা তাঁর হৃদয়ের কথা বুঝেছি?

তাঁর হৃদয়ের কথা যথার্থভাবে বুঝতে হলে, তাঁর স্বপ্ন সফল করতে হলে আমাদের পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের দায়িত্ব পালন করতে হবে। সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হলে ভারতীয় নবজাগরণের মনীষীদের ও নেতাজি সহ বিপ্লবী যোদ্ধাদের অপূর্ণ স্বপ্ন সফল করার জন্য এবং অত্যাচরিত জনগণকে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতবাদ মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ ছাত্র-যুবকদের কাছে যে ঐতিহাসিক আহ্বান জানিয়েছেন তাতে সকলকে সাড়া দিতে হবে। তিনি বলেছেন, "মনে রাখবেন, শুধুমাত্র আদর্শের জন্য শুরুতেই যাঁরা জীবন দিতে এগিয়ে আসেন তাঁরা কোনওদিনই সংখ্যায় বেশি থাকেন না। তাঁরা সবসময়ই মুষ্টিমেয়। তাঁরা প্রাণবন্ত ছাত্র-যুবক। প্রতিটি দেশে সমাজবিকাশের প্রতিটি স্তরে এই ছাত্র-যুবকরাই বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসেন, পরিপূর্ণ নিষ্ঠা নিয়ে জনগণের কাছে যান, হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন, জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে সাহায্য করেন। এরপরই সময় আসে গণঅভ্যুত্থানের, আর তাকেই আমরা বলি বিপ্লব। তার আগে আপনাদের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে—যা কঠোর, কঠিন, কষ্টকর,

৮৭, ৮৯ ঃ (বিপ্লব কি - নেতাজি) ; ৮৮ ঃ (লোকমত - নেতাজি)

কিন্তু আনন্দময়। আমি বলি এটাই সবচেয়ে আনন্দের এবং মর্যাদার পথ। হ্যাঁ, সংগ্রামের এই পথ অত্যন্ত বেদনাময় হতে পারে, কখনও কখনও তা খুবই কষ্টসাধ্যও হতে পারে, তবুও এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, মর্যাদাময় জীবনযাপনের এটাই একমাত্র পথ। এই সংগ্রামে আপনাদের মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে, কিন্তু আপনারা মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করেই মৃত্যুকে বরণ করবেন। অবমাননা এবং গ্লানি নিয়ে কুকুর-বেড়ালের মতো রাস্তায় পচে মরবেন না। মনে রাখবেন, মানুষ মাত্রেই মরণশীল। তাই মরতে যখন হবেই তখন নিজেকে করুণার পাত্র করে, অবমানিত করে, ভিক্ষুকের মতো মরবেন না। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন মর্যাদার সাথেই মৃত্যুকে বরণ করুন। আর মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা বা মৃত্যুকে বরণ করার একটাই মাত্র নিশ্চিত পথ রয়েছে। তা হল, সমাজের আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের যে বিপ্লবী সংগ্রাম তাতে নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করা। বলা বাহুল্য, এর জন্য অতি অবশ্যই হাজারে হাজারে আপনাদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

... ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে জনসাধারণের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করুন, সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন এবং আপনাদের রাজনৈতিক উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে চলুন।

আপনাদের শ্লোগান হবে—জনসাধারণের কাছে যান, তাদের সংগঠিত করুন, তাদের রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করুন যাতে মেহনতি মানুষ একদিন নিজেরাই অস্ত্রধারণ করতে পারে এবং বুর্জোয়া শ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারে।"[৯০]

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'

৯০ ঃ ছাত্র ও যুব সমাজের কর্তব্য — শিবদাস ঘোষ